1026

নাই ; তবে মনে হয়, তখনকার ভোজকগণের ভাষা ও ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণের ভাষায় অধিক ভেদ ছিল না। সেইজন্যই তাহারা পূজকরূপে সম্মানিত হইয়াছিল। অশোকের অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) উভয়েই প্রায় তখনকার সমাজে সমান সম্মান প্রাপ্ত হইত। ভবিষ্য-পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভোজক ও ব্রাহ্মণ সেকালে সমান সম্মান প্রাপ্ত হইত, বরং কোন কোন স্থানে সূর্য্যভক্তের নিকট ভোজকই অধিক সম্মান প্রাপ্ত হইত। সপ্তমী-ব্রত-সম্বন্ধে লিখিত আছে, সপ্তমী তিথিতে প্রভাতে সূর্য্যমন্ত্র (সূর্য্য গায়ত্রী) সংযতচিত্তে জপ করিবে ও পূর্ব্বোক্ত বিধি-অনুসারে সূর্য্যের পূজা করিবে ; তাহার পর শ্রদ্ধা সহকারে ও শক্তি অনুসারে নানাবিধ ভোজ্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণভোজন-ব্যাপারে বিত্তশাঠ্যং (অর্থাৎ শক্তি সত্ত্বে কৃপণতা) করিবে না। ভোজকগণকেও ভোজন করাইবে কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহারা অসৌর (সূর্য্যভক্ত নয়) তাহাদের ভোজন করাইবে না। সৌরগণকে যত্ন করিয়া ভোজন করাইবে। ভানুর দেহ-সমুদ্ভব ভোজককে আদিত্য বলিয়া জানিবে। যে আদিত্যের পূজা না করে এইরূপ, ভোজককে ভোজন করাইবে না। মুণ্ডিতমস্তক, অব্যংগধারী, গৌর শঙ্খ-ও পুষ্পধারী ভোজক যে মানবের গৃহে গমন করে, সেই সূর্য্যভক্তের গৃহে সমস্ত দেবতা ও পিতৃগণ আগমন করেন। রাক্ষস, ভূত, পিশাচ ও যোগিনীগণ সেই গৃহ হইতে পলায়ন করে। যে গৃহস্থের বাটীতে ভোজক (মগ) একবারমাত্রও ভোজন করে, সপ্ত বৎসর পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব তাহার দ্বারা তৃপ্ত হইয়া থাকেন। বৃত্তি লইয়া অন্য কোন ব্রাহ্মণ যদি দেবালয়ে দেব-পূজা করে, তথায় আধিপত্য করে বা দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে তবে সে দেবল বলিয়া কথিত হইবে ও পতিত হইবে, এইরূপ ভাবে ভবিষ্যপুরাণে কথিত আছে। শিবালয় ব্যতীত অন্য সর্ব্বদেবালয়ে দেবতাদিগের পূজনে ও অগ্নিকার্য্যে (হোমে) ভোজক-দিগেরই অধিকার আছে। ভোজকগণ দেব-পূজা করিয়া ও নৈবেদ্য ভোজন করিয়া দিব্য-স্থানে যথায় আদিত্য বিরাজমান আছেন, তথায়—গমন করে। *

ভোজকগণ সৌরভক্তগণের নিকট কি প্রকার সম্মান পাইয়াছিল, তাহা ভোজকাষ্ট-ব্রত-বিষয়ে কথিত হইয়াছে। তাহার বিধান এইরূপ :—সৌরভক্তে সর্ব্বদা ক্ষমা, অহিংসা, শমগুণাবলম্বী হওয়া, সন্তোষ, সত্য, অস্তেয়

---

* আদিত্যং ভোজকং বিদ্যাদ্‌ভানোর্দেহসমুদ্ভবম্।
নাদিত্যং পূজয়েদ্ যস্তু স ভোজ্যো ন কদাচন ॥ ৩৪
মুণ্ডোঽব্যংগধরো গৌরঃ শঙ্খপুষ্পধরস্তথা।
যস্য যাতি গৃহে রাজন্ ভোজকো মানবস্য তু ॥
তস্য যান্তি গৃহে দেবাঃ পিতরো ভাস্করস্তু।
রক্ষোভূতপিশাচাশ্চ যোগিন্যোঽপি পলায়িতাঃ ॥
সকৃৎ ভুংক্তে গৃহে যস্য ভোজকো গৃহমেধিনঃ।
সপ্তসংবৎসরং যাবৎ তৃপ্তো ভবতি ভাস্করঃ ॥

ভবিষ্যপুরা ১মা২১০।৩৪-৩৭

দেবালয়েষু সর্ব্বেষু বর্জ্জয়িত্বা শিবালয়ম্
দেবানাং পূজনে রাজন্নগ্নিকার্য্যেষু বা বিভো।
অধিকারঃ স্মৃতো রাজন্ ভোজকানাং ন সংশয়ঃ ॥
পূজয়িত্বা তু দেবান্ নৈবেদ্যং ভক্ষ্য চ প্রভো।
যান্তি তে পরমং স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ ॥

২১০।২৭-৩০

(চুরি না করা) ও ব্রহ্মচর্য্য, যথাসম্ভব-শুদ্ধা- ত্মায়, কায় মন ও বাক্যের দ্বারা সূর্য্য-ভক্তের প্রতি বিশেষতঃ ভোজকগণের প্রতি ভক্তি করিবে। পণ্ডিতগণ স্বদেহ-নির্ব্বিশেষে ভোজকগণকে ভয়-দারিদ্র্য রোগ হইতে রক্ষা-পূর্ব্বক পালন করিবে; তাহাদের প্রিয় কার্য্য করিবে। মনুষ্য পরিপূর্ণ-স্বর্য্যের কি করিতে পারে। ভোজকগণের সম্বন্ধে যাহা কৃত হইবে, তাহাই ভাস্করের সম্বন্ধে সম্পাদিত হইয়াছে জানিবে। যে-স্থানে মগগণ অবস্থিতি করে, তাহা বহু দূর হইলেও তথায় গমন করিবে। মগগণকে যত্ন-সহকারে দর্শন করিবে; কারণ, যথায় মগগণ অবস্থিতি করে, তথায় সূর্য্যদেব সন্নিহিত থাকেন। সূর্য্য-পূজারত ভক্ত ভোজকের আজ্ঞা যথানিয়মে পালন করিয়া অশ্বমেধের ফল লাভ করে।*

নিক্ষুভার্ক-ব্রত-সম্বন্ধে কথিত আছে যে, একবৎসর ব্রত করিবার পর ভোজক-দম্পতীকে ভোজন করাইবে ও তাহাদিগকে গন্ধমাল্য- ও বস্ত্র-দ্বারা পূজা করিবে; কারণ, নিক্ষুভা ভোজকী ও ভোজক অর্কস্বরূপ। (নিক্ষুভা ভোজকী জ্ঞেয়া ভোজকোঽর্কঃ প্রকীর্ত্তিতঃ), এই সমস্ত বর্ণনা হইতে দেখা যাইতেছে যে মগগণ সূর্য্য-পূজকরূপে ভারত-বর্ষে আনীত হইয়া বিশেষ সম্মান পাইয়াছিল। সেই সময় হইতে উত্তর ভারতবর্ষে সূর্য্যদেবের বহু মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল ও যাত্রিগণ বহু দূর হইতে এই সমস্ত মন্দিরে সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিত।

ইতিহাসে রমণী।

পঁচাশী বৎসর পূর্ব্বে যখন নিশীথ-রাত্রে ইংলণ্ড-রাজ চতুর্থ উইলিয়ামের মৃত্যু হইল তখন হইতেই তাঁহার ভ্রাতৃ-দুহিতা ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল আরম্ভ। দেশের প্রধান ধর্ম্মযাজক ও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ভিক্টোরিয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্ঞী বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। রাণী প্রধান পুরোহিতকে বলিলেন, "আপনি পরমেশ্বরের নিকট আমার জন্য প্রার্থনা করুন।" তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস এত অল্প বয়সেই ও এতই গভীর ভাবে নিহিত হইয়াছিল!

অল্পবয়স্কা রমণী যে উচ্চপদে আসীনা হইলেন, তাহা অলঙ্কৃত করিবার জন্য যে সকল গুণ আবশ্যক সেগুলি তাঁহার চরিত্রে পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই মানব ভদ্র হয় না। যাঁহারা অপরের মনো-ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনাদিগের বাক্য ও আচরণ সংযত করেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিয়া অপরের মনে ক্লেশ দেন না তাঁহা-রাই 'ভদ্র' আখ্যা লাভের যথার্থ অধিকারী। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর রাণী ভিক্টোরিয়া যখন দুঃখ ও সহানুভূতি জানাইয়া পিতৃব্য-পত্নীকে পত্র লিখিলেন, তখন সে-পত্রের শিরোনামায় পিতৃব্য পত্নীর নামের সহিত 'রাজ্ঞী' শব্দ ব্যবহার করিলেন। ভিক্টোরিয়াকে যখন বলা হইল

---

* যদূরমপি গচ্ছেয়ুঃ মগানাং কৃত বৈ গণঃ।
স চ প্রযত্নাৎ গন্তব্যস্তত্র সন্নিহিতো রবিঃ॥
ভোজকস্য তু ভক্তস্য সূর্য্য-পূজারতস্য চ। আজ্ঞাং কৃত্বা যথান্যায়মশ্বমেধফলং ভবেৎ॥ ১৩৯।১২৮-২০

যে তাঁহার পিতৃব্য পত্নী সে সময় আর রাজ্ঞী নহেন, সুতরাং তাঁহাকে পত্রে ভূতপূর্ব্ব রাজ্ঞী বলিয়া সম্বোধন করা উচিত,—তাহার উত্তরে নূতন রাজ্ঞী বলিলেন যে সে কথা তিনিও জানেন, তবে তিনিই সকলের অগ্রে তাহা তাঁহার পিতৃব্য পত্নীকে স্মরণ করাইয়া দিবেন না। বিষয়টি দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা বেশ বুঝাইয়া দেয় ভিক্টোরিয়ার হৃদয় কত উচ্চ ছিল এবং তিনি কিরূপ বিবেচনার সহিত অপরের হৃদয় ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতেন।

মন্ত্রি-সভায় তিনিতাঁহার পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের প্রতি যে সৌজন্য ও স্নেহ প্রদর্শন করিতেন্ তাহা স্বাভাবিক। তাহাতে অসাধারণত্ব কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অভিষেকের দিনে রাণী সম্ভ্রান্তবংশীয় একজন অতি বৃদ্ধ লোকের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব ও সহৃদয়তা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ রাণীকে অভিবাদন ও তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিবার জন্য সিংহাসনের সোপান বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল বলিয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি পুনরায় উঠিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু রাণী স্বয়ং সিংহাসন হইতে নামিয়া বৃদ্ধের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন,—যাহাতে বৃদ্ধকে আর সোপান-শ্রেণী বাহিয়া উঠিতে না হয়।

তাঁহার কোমল হৃদয়ের একটি পরিচয় তাঁহার শাসনকালের প্রারম্ভেই পাওয়া গিয়াছিল। একজন সৈনিক বার বার আপনার সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। এরূপ অপরাধীর গুরুতর শাস্তিই ঘটিয়া থাকে। সামরিক বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তখন এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা-পত্রে যিনি সিংহাসনে আসীন তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে হইত। এরূপ সাংঘাতিক পত্র রাণীর সন্থুখে সেই সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত হইল। যখন প্রধান সেনাপতি ঐ পত্র স্বাক্ষর করাইবার জন্য রাণীর নিকট লইয়া গেলেন, রাণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে বলিলেন, "ইহার পক্ষে আপনার কি কিছুই বলিবার নাই।" সেনাপতি যখন তাহার অপরাধ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, যে তাহার পক্ষে কিছুই বলিবার নাই, তখন রাণী তাঁহাকে পুনরায় ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। সেনাপতি তখন জানাইলেন যে সৈনিক-হিসাবে তাহার চরিত্র দূষণীয় হইলেও পারিবারিক জীবনে তাহার চরিত্র প্রশংসার যোগ্য। এই কথা শুনিবা মাত্র ভিক্টোরিয়া হতভাগ্যের বধ-আজ্ঞা রহিত করিয়া সে-পত্রে 'তাহাকে মার্জ্জনা করা হইল,' এই কথা লিখিয়া দিলেন।

তাহার পরও তিনি কখন এরূপ পত্রে স্বাক্ষর করেন নাই। ক্রমে এরূপ একটি নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইল যাহাতে প্রাণদণ্ডের আদেশযুক্ত পত্রে তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে হইত না। ভিক্টোরিয়া রমণী-সুলভ কোমলতা-বশতঃ অপরাধিগণের প্রতি যেটুকু শাস্তি দান করিতে হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতেন, ইংলণ্ডের অপর একজন রাণী তাহা অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর শাস্তি শত শত নিরপরাধ হতভাগ্যগণের প্রতি বিধান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ভিক্টোরিয়ার শাসনকালের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে

ইংলণ্ডের নির্দ্দয়া রাণী মেরীর প্ররোচনায় এবং আদেশে কত শত বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নর-নারী জীবন্ত দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কালের পৃষ্ঠা যেমন দিবস-রাত্রির আলোক-আঁধারে অনুলিপ্ত হয়, সেইরূপ ইতিহাসেরও এক পৃষ্ঠা পুণ্য স্মৃতিতে উজ্জ্বল এবং অপর পৃষ্ঠা কুকার্য্যের বর্ণনায় কলঙ্কিত। পৃথিবীতে যে সকল কার্য্যের বিচার হয় না, ভবিষ্যযুগের ইতিহাস তাহাদিগের বিচার এইরূপে করিয়া থাকে।

মেরীর বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই। এলিজাবেথ জীবনে বিবাহ করেন নাই; সেই জন্য তাঁহার জীবন পূর্ণতালাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু রাণী ভিক্টোরিয়ার বিবাহিত জীবন বড় সুখের হইয়াছিল। উপযুক্ত স্বামী ও নয়নানন্দদায়ক পুত্র-কন্যাগণের সংসর্গে তাঁহার জীবন বাস্তবিকই মধুময় হইয়াছিল। বাল্যকালে সুশিক্ষা কিরূপ প্রয়োজন তাহা তিনি আপনার শৈশব-জীবনের ইতিহাস হইতেই জানিতেন। সেই জন্য তিনি আপনার সন্তানগণের শিক্ষার জন্য বিধিমত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের জীবনে ধর্ম্ম-ভাব প্রবল ছিল। আরও তিনি জানিতেন পুস্তক-পাঠ করিয়া জ্ঞানার্জ্জন অপেক্ষা ধর্ম্ম-শিক্ষা ও নীতি-শিক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। সেই জন্য তিনি পূর্ণ শিক্ষার এই দুইটি অঙ্গের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। একবার তাঁহার অল্পবয়স্কা দুই কন্যা ক্রীড়াচ্ছলে এক পরিচারিকার মুখ তুলিকার সাহায্যে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। মাতার আদেশে রাজ-কুমারীদ্বয় পরিচারিকার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং আপন আপন বৃত্তি হইতে তাহাকে একটি নূতন পোষাক নিজেরা ক্রয় করিয়া দিলেন। যাঁহারা রাজপদে আসীন, তাঁহারা সকলকে সম্মানে ভূষিত করিতে পারেন এবং পদগৌরবে তাঁহারা সকলের নিকট হইতে সম্মান-লাভের অধিকারী। এরূপ স্থলে যদি তাঁহারা বা তাঁহাদের সম্প-কীয় কেহ অপরের সম্মান হরণ করেন, তাহা হইলে সম্মানের উৎস আপনা হইতে পঙ্কিল হইয়া যায়। যাঁহারা সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় তাঁহাদেরই আচরণ সাধারণে অনুকরণ করিয়া থাকে। সেইজন্য উচ্চ পদের গৌরব যতখানি, তাহার দায়িত্ব তাহা অপেক্ষা অধিক। ভিক্টোরিয়া আপনার সন্তানগণকে শাসন করিয়া সদ্বিবেচনারই পরিচয় দিয়া-ছিলেন।* ক্রমশঃ

* এক ফরাসী নরপতিরও সম্বন্ধেও এইরূপ একটি গল্প শুনা যায়। ফরাসীরাজ একদিন দেখিলেন যে একটি রাজকুলবধূ একজন কুদর্শন ব্যক্তিকে দেখিয়া ব্যঙ্গ-উপহাসের হাসি হাসিতেছেন। তিনি ঐ মহিলাকে বলিলেন, "ঐ ব্যক্তি আমার একজন সাহসী সেনাপতি তোমার আচরণের জন্য তোমাকে উঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, মহিলাটি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

সমালোচনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সিংহ কর্ত্তৃক পদ্যে অনূদিত ও ২৪ পরগণার মথুরাপুর হইতে শ্রীযুক্ত নিত্যরঞ্জন সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বাঁধাই অনুসারে মূল্য ১৲ হইতে ১।০ কাগজ ও মুদ্রণ-পরিপাটি ভালই হইয়াছে।

গ্রন্থকার অনুবাদটী প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

December, 1922. Reg. No. C. 134

৬০ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৯—ডিসেম্বর, ১৯২২।

সূচী

সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দত্ত এম্-এ কর্ত্তৃক ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵৹ ; ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৹ ;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ (চারি আনা) মাত্র।



বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 712. December, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৬০ বর্ষ। ৭১২ সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। ডিসেম্বর, ১৯২২।	১২শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গান।

বাজে বাজে মঙ্গল-বীণা বাজে,
বিশ্ব-ভুবন মাঝে,
পূজিতে বিশ্বরাজে!
অবশ প্রাণ! কেন রে ম্লান,
কেনরে কাঁদিস্ মরে,
বিষাদ-দৈন্য মাঝে!

বাজে বাজে মঙ্গল-বীণা বাজে!
জাগরে প্রাণ! আরতি-গান
গাও রে চিত্ত ভরে,
ভক্ত-পূজারি-সাজে!
বাজে বাজে মঙ্গল-বীণা বাজে!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

অষ্টম অধ্যায়।

অর্জ্জুন সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করিয়া কতকগুলি শব্দের অর্থ যথার্থরূপে বুঝিতে না পারিয়া ভগবান্‌কে এই অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমেই তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসিলেন, "ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কাহাকে বলে, কর্ম্ম কি, অধিভূত কি, আধিদৈব কি, অধিযজ্ঞ কি এবং মরণকালে নিয়তাত্ম যোগী আপনাকে কিরূপে অবগত হন?"

ভগবান্ ইহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন "যিনি সর্ব্বপ্রকার ক্ষয় ও বিকার-বিহীন তিনিই ব্রহ্ম। আর স্বভাব অর্থাৎ আত্মভাব যাহা তাহাই অধ্যাত্ম। এই অধ্যাত্মই শরীর-সম্বন্ধেই উৎপন্ন হয়। আর যাবতীয় ভূতগ্রামের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকারী যে সকল যজ্ঞ অর্থাৎ প্রাণক্রিয়া

তাহাই কর্ম্ম বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। ইহাই সূক্ষ্ম সৃষ্টির ও প্রলয়ের কারণরূপ নানা যজ্ঞ, যাহা দেবোদ্দেশে আচরিত হয়। আর সংসারে যত প্রকার পঞ্চভূতাত্মক বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সর্ব্বদাই ক্ষরভাবাপন্ন অর্থাৎ সততই হ্রাস বৃদ্ধি ও নাশ রূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাকেই অধিভূত কহে। আর ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে চৈতন্য প্রবিষ্ট থাকিয়া সর্ব্ববিধ চেষ্টা সাধিত করিতেছেন তিনিই অধিদৈব পুরুষ। এবং সর্ব্ব দেহধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে তুমি অর্জ্জুন, তুমি আমাকেই সকল দেহে অধিযজ্ঞরূপে জ্ঞাত হইও। এ সকলই এক যে আমি, সেই আমারই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ বলিয়া অবগত হইও। মরণ-সময় যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হইয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হন বা আমিই হইয়া যান। কারণ, এই একটি স্থির-নিশ্চয় নিয়ম আছে যে যে ব্যক্তি মরণ-সময়ে যাহা ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করে, সে ব্যক্তি মরণানন্তর তাহাই প্রাপ্ত হয়। কারণ সে মরণের পূর্ব্ব হইতেই সদা তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া তদ্রূপই হইয়া পড়ে।"

এই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, "অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বকালেই আমাকে স্মরণ করিতে থাক এবং প্রাণক্রিয়া-রূপ যুদ্ধও কর। যদি আমাতে সম্পূর্ণরূপে মন-বুদ্ধি অর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। কারণ, অভ্যাস-যোগযুক্ত হইয়া অনন্যমনে সতত চিন্তা করতঃ দিব্য পরম পুরুষই যে আমি, সেই আমাকেই পাইবে অর্থাৎ আমিই হইয়া যাইবে। মরণ-কালে কিরূপে আমাকে চিন্তা করিয়া পাইবে তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। অর্থাৎ যখনই বুঝিবে যে অন্তকাল উপস্থিত তখনই সতত ক্রিয়া-যোগ-অভ্যাসে যে শক্তি উপার্জ্জন করিয়াছ তাহার বলে প্রাণকে ভ্রূয় মধ্যে অর্থাৎ দ্বিদল মধ্যে নীত ও স্থির রাখিয়া সনাতন-সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম এবং সকলের ধারণকর্ত্তা প্রকৃতির পর-পারস্থ অচিন্ত্য-রূপ অর্থাৎ অলৌকিক-রূপ আদিত্যবর্ণবিশিষ্ট আমাকে অনন্যমনে ও পরম ভক্তিসহকারে চিন্তা করিতে থাকিবে, তাহা হইলেই দেহান্তে আমাকেই পাইবে। এইজন্যই বলে, তপ জপ করিলে কি হইবে, মরিতে জানিলে হয়।' এই দিব্য পরম অক্ষর পুরুষের বিষয়ই বেদান্তবাদিগণ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন, যতিগণ সর্ব্ববিধ অনুরাগশূন্য হইয়া ইঁহাতেই প্রবেশ করেন এবং ব্রহ্মচারিগণ ইঁহারই উদ্দেশ্যে সদা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন! তোমাকে সেই পরম পদের কথাই সংক্ষেপে বলিতেছি। অর্থাৎ যিনি এই শরীরস্থ নবদ্বার নিরুদ্ধ করিয়া, মনকে হৃদয় মধ্যে সন্নিরুদ্ধ করিয়া, এবং যোগধারণা-বলে প্রাণকে মস্তকস্থ সহস্র-দলে স্থাপিত করিয়া ওঁ এই একাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে, আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনিই সেই পরম শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ, যে যোগী নিত্য সর্ব্বদা অনন্যমনে আমাকে স্মরণ করিতে থাকেন, তাঁহার পক্ষে আমি অতিসুলভ। এই পরম সিদ্ধিরূপ আমাকে যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে এই অস্থায়ী সর্ব্ব দুঃখের আলয়স্বরূপ এই সংসারে আর জন্মগ্রহণ

...য়িতে হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা আমিই হইয়া চির শান্তিময় হন। এই পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যত স্থান আছে তত্রবাসীরা সকলেই পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।"

এক্ষণে ভগবান্ অর্জ্জুনকে ব্রহ্মার দিবস ও রাত্রির বিষয় বলিয়া সৃষ্টি ও প্রলয়ের বর্ণন করিতেছেন। তিনি বলিলেন যে সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং তৎপরিমাণ যুগে তাঁহার রাত্রি হইয়া থাকে। ইহা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা অহোরাত্রবিৎ। ব্রহ্মার এই দিবস-সময়েতে অব্যক্ত হইতে এই যাবতীয় পরিদৃশ্যমান ব্যক্তভাব প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার রাত্রির মধ্যে আবার সকলই সেই অব্যক্ততেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মার যেমন দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর আবার দিন হইতেছে সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডও একবার প্রকাশিত এবং তৎপরে লয়প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা চক্রবৎ চলিতেছে। অর্থাৎ প্রত্যেকের যেমন স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন অবস্থা আছে সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও ঐ তিন অবস্থা আছে। ধ্বংস কিছুই হয় না, কেবলমাত্র এই তিন অবস্থা ঘুরিয়া ফিরিয়া হইতেছে। যখন জগৎ পরিদৃশ্যমান স্থূল অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে সৃষ্টি হইল বলা হয় এবং যখন অব্যক্ত কারণে প্রবিষ্ট হয় তখন তাহাকে প্রলয় বলা হয়। তিনি ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "অর্জ্জুন! এই যে কারণরূপ অব্যক্ত অবস্থার কথা তোমাকে বলিলাম, তাহাই শেষ নহে। তাহার পরেও ঐ কারণেরও পরমকারণ স্বরূপ আর একটি পরম অব্যক্ত জিনিষ আছে। তাহাই সকলের মূল ও আদি এবং শেষ কারণ। সে কারণের আর অন্য কোন কারণ নাই। সেই কারণই পরম অব্যক্ত এবং সনাতন অর্থাৎ চিরকাল একরূপ, পরিবর্ত্তনবিহীন। সুতরাং সকল বিনষ্ট হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় না। এই অব্যক্ত মানুষের অক্ষর পরম গতি, এই গতি প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর নিবর্ত্তিত হইতে হয় না অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহাই আমার পরম ধাম ও বিষ্ণুর পরম পদ। এই পুরুষই প্রকৃতির পরপারস্থ, কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারাই তিনি লব্ধ হন। তিনি সকলের অধিষ্ঠানরূপে স্থিত এবং সকলই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। তিনিই সকলের অন্তর্বাহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন।"

তারপর ভগবান্ অর্জ্জুনকে আর একটি এই সত্য উপদেশ দিতেছেন, "অর্জ্জুন! যে-কালে যোগীর দেহত্যাগ হইলে আর জন্ম হয় না এবং যে-কালে দেহত্যাগ করিলে আবার জন্ম হয়, তাহা বুঝাইয়া দিতেছি, শ্রবণ কর।" তিনি বলিলেন যে শুক্ল ও কৃষ্ণনামে দুইটি পথ আছে। তন্মধ্যে প্রথম পথ দিয়া যাইতে পারিলে আর জন্ম হয় না এবং দ্বিতীয় পথ দিয়া গমন করিলেই আবার জন্ম হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ হইতে ছয়মাস পর্য্যন্ত সময়-মধ্যে দেহত্যাগ হইলে আর ফিরিতে হয় না, কিন্তু দক্ষিণায়ন হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মরিলে আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, নির্ব্বাণ মুক্তি হয় না। যোগিগণ এই সনাতন শুক্ল ও কৃষ্ণ নামক পথদ্বয় এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন রূপ কাল-দ্বয় অবগত হইয়া সাধারণ লোকদিগের মত

মোহপ্রাপ্ত হন না। তাঁহারা সতত ভগবানের কথিত ও প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিয়া সদা সচৈতন্য থাকেন এবং দৃঢ়-অভ্যাসপ্রসূত সুগম পথাবলম্বনে মোক্ষধামে উপনীত হইয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন লোকে আপনাপন কর্ম্মদোষে হয় নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়, না হয় শুভ কর্ম্মগুণে দেব ও পিতৃস্বর্গ লাভ করিয়া কিছু কাল সুখভোগ করিয়া আবার এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। সুতরাং সমুদয় বেদ-পাঠে, যজ্ঞাচরণে, তপস্যাতে ও দান-ক্রিয়া হইতে যে সমুদায় পুণ্যফল উৎপন্ন হয়, ভগবান্ বলিলেন তাঁহার কথিত ক্রিয়া-যোগানুষ্ঠান করিলে সে সকলকে অতিক্রম করিয়া একেবারে মোক্ষধামে যে পরম বিষ্ণু-পদ, সাধক তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহাই অক্ষর-যোগ।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ভগবানের মহাশক্তির কার্য্য। ভগবান্ অনন্ত নিষ্ক্রিয় চৈতন্যরূপে বিস্তীর্ণ পট-স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং প্রকৃতি বা শক্তি তাহার উপর কতই রচনা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃতি দেবী একা বহুধা বিভক্ত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ রঙ্গভূমিতে কত প্রকারেই সে অভিনয় করিতেছেন, তাহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে। ইনিই কারণ ও কার্য্য উভয় রূপই হইয়া সেই অক্ষর মহাকারণকে আশ্রয় করিয়া এই বিচিত্র রচনা সদাই সম্পন্ন করিতেছেন। মনুষ্য-শরীরে এই মহাশক্তি কুণ্ডলিনীরূপে এবং অংশভূত শক্তিসমূহ তেত্রিশ-কোটি দেবতারূপে স্থিত থাকিয়া সকল কার্য্যই সমাধা করিতেছেন। মানুষ যদি সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে ক্রিয়াযোগের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া এই দেবতাসকলকে বশি[illegible] ও সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাকে মরণান্তে আলোকময় পথ দি[illegible] গন্তব্যস্থানে উপনীত করেন। এই পথকেই শুক্লপথ বা দেবযান বলে। মানুষ ক্রিয়া-যোগানুষ্ঠান করিয়া প্রত্যক্ষরূপে ভগবৎসত্ত্ব অনুভব করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিলেই ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তিলাভ করেন। ইহাই সদ্যো মুক্তি। আর যদি সম্পূর্ণরূপে তাহা নাও হয়, তাঁহারা ঐ সাধককে ব্রহ্মলোকে উপনীত করেন। সেখানে বর্ণনাতীত বিবিধ সুখ বহুকাল ভোগ করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। ইহাই ক্রমোন্নতিরূপ ক্রমমুক্তি। আর যাহারা বিবিধ লৌকিক যজ্ঞ এবং কূপ ও পুষ্করিণী-খনন প্রভৃতি সৎকর্ম্ম করেন, তাঁহারা ধূমমার্গ হইয়া ঐ দেবতাদেরই সাহায্যে দেবস্বর্গ ও পিতৃস্বর্গ হইয়া চন্দ্রলোকে উপনীত হন; এবং পুণ্যক্ষয় হইলেই আবার পুনরাবৃত্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। আর যাহারা সদা পাপী ও নিতান্ত তমসাচ্ছন্ন, তাহারা এই পথদ্বয়ের কোনটাই না পাইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নিকৃষ্টযোনি প্রাপ্ত হয় অথবা বৃক্ষ-লতা ও পাষাণাদি হইয়া থাকে। এই শুক্ল ও কৃষ্ণ পথদ্বয় সনাতন। জীবদ্দশাতেই মানুষের ক্রিয়া ও জ্ঞান-দ্বারা স্বীয় হৃদয় হইতে গম্যস্থান পর্য্যন্ত পথরূপে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভগবান্ এই অষ্টম অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে এই সকল রহস্যই বুঝাইয়া দিলেন। ইহার লক্ষ্যস্থল অক্ষরব্রহ্ম, তাই অধ্যায়ের নাম অক্ষর-যোগ হইল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দত্ত।

গান ।

(রচনা—মৌলবী গুলাম্ মুস্তফা সাহেব্, বি-এ, বি-টি)

আরো আঘাত দিতে হ'বে প্রভু আমার হৃদয়-তারে ;
এতটুকু বেদনাতে আমার বীণা বাজ্‌বে না রে !
ব্যথা-ভরা কঠিন করে,
পরশ কর হিয়ার পরে,
সকল হিয়া কেঁপে কেঁপে উঠুক কেঁদে বারে বারে ;—
মনের কোণের গোপন কথা আসুক ভেসে নয়ন-ধারে !
বুকে আমার যখন তুমি দিলে প্রভু প্রথম ব্যথা,
ভেবেছিলাম ক্ষুদ্র আমি—অত ব্যথা রাখ্‌ব কোথা ?
ভেঙ্গে গেছে আজ্‌কে সে ভুল,
পাষাণ আমি—নইক রে ফুল ;
আমার হৃদয় হাসিমুখে আরো আঘাত সইতে পারে,—
গভীর ব্যথার পরশ দিয়ে আঘাত করো এবার তারে !!

সুর ও স্বরলিপি ।

[শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

জৌনপুরী-কানাড়া—ঝাঁপতাল ।

স্থায়ী ।

২´	৩		০		১		
II{পা	জ্ঞা । মা	রজ্ঞা	-সা । ন্‌সা	সরা । সা	-ন্‌সা	দ্‌ণ্‌া I
আ	রো আ	ঘা॰	ত্ দি॰	তে॰ হ	॰॰	বে॰
২´	৩		০		১		
Iপ্‌প্‌া	প্‌া । ম্‌া	প্‌দ্‌া	দ্‌ণ্‌দ্‌ণ্‌া । সন্‌া	র্সর্া । পদমা	-পা	জ্ঞা I
প্র	ভু আ	মা॰	র॰॰॰ হৃ	দ॰য়	তা॰॰॰	॰	রে
২´	৩		০		১		
Iজ্ঞা	মজ্ঞা । মা	মা	পা । মপা	পা । দণদণা	র্সা	দণপা I
এ	ত॰ টু	কু	বে দ॰	না তে॰॰॰	আ	মা॰র্
২´	৩		০		১		
Iমপা	-দণা । -র্সা	র্সা	মা । -ণণা	পা । মা	-পমা	জ্ঞরা}II
বী॰	॰॰ ॰	ণা	বা ॰জ্	বে না	॰॰	রে॰

অন্তরা।

২ ৩ ০ ১
II{পা মজ্ঞা। মা রা সা। মসা -া। সা -ন্‌রা রা I
বা খাং ভ রা ক ঠিং ন্‌ ক ০০ রে

২ ৩ ০ ১
I মা পা। দা দা দণা। মা পদা। -া নর্সা র্সা I
প র শ্‌ ক রুং ছি হাং র্‌ পং রে

২ ৩ ০ ১
I মা পপা। দা দা -নর্সা। নর্সা র্সা। র্রর্সা -ন্‌া র্সা I
ম কল্‌ ছি য়া ০০ কেঁং পে কেঁং ০ পে

২ ৩ ০ ১
I র্সনা র্রর্সা। -র্রা জ্ঞর্মা র্সা। নর্সা র্সা। দা -পা পা}I
উং ঠুং ক্‌ কেঁং দে বাং রে বা ০ রে

২ ৩ ০ ১
I{মা মমা। পা -া পপা। মা পপা। দা -নর্সা র্সা I
ম নের্‌ কো ০ পের্‌ গো পন্‌ ক ০০ থা

২ ৩ ০ ১
I দণা পপা। মা -পা পা। মা পণা। -া জ্ঞমা রা}II
আং বুক্‌ তে ০ যে ন রুং ন ধাং রে

সঞ্চারী।

২ ৩ ০ ১
II{সা সণা। দা ণা -পা। মা পপা। দা -পা পা I
হ্‌ কেং আ মা র্‌ য থন্‌ তু ০ মি

২ ৩ ০ ১
I মা পা। দদা -না র্সা। র্রর্রা র্সনা। -র্সা নর্সা র্সা I
দি লে প্র ০ তু প্র থং ন্‌ ধ্য থা

২ ৩ ০ ১
I না র্সা। র্রা র্রা -া। নর্সা র্সর্সা। ণা দণা পা I
ভে বে ছি লা ম্‌ শুং ক আ ০০ নি

২ ৩ ০ ১
I মা পা। না -র্সা র্সা। জ্ঞজ্ঞা মা। রা -জ্ঞা সা}I
অ ত বা ০ থা রাখ্‌ ব কো ০ থা

আভোগ।

২ ৩ ০ ১
I{মা পা। দা -না র্সা। সর্সা র্রনা। র্সা র্সা -া I
তে জে গে ০ ছে আজ্‌ কেং গে তু ন্‌

২´	৩		০		১		
I র্সা	র্সনা । -র্রা	র্জ্ঞা	র্মা । র্রর্রা	র্রা । রজ্ঞা	সা	-া I	
পা	যা॰ ন্	যা	মি নই	ক রে॰	ছু	ন	
২´	৩		০		১		
I ণদা	ণাদদা । ণণা	পা	-া । মপা	পা । না	-র্সা	র্সা I	
আ॰	না॰র্	দ্ব	দ	য় হা॰	সি য়	॰	সে
২´	৩		০		১		
I মা	মা । পদা	পা	-পা । মা	-া । পণা	জ্ঞমা	রা I	
আ	রো আ॰	ঘা	ত্ স	ই তে॰	পা॰	রে	
২´	৩		০		১		
I র্রা	র্রর্রা । র্সর্সা	র্রর্পা	-া । র্মা	র্জ্ঞা । -র্মা	র্রা	র্সা I	
গ	ভীর্	বা	থা॰	র্ প	র শ্	দি	যে
২´	৩		০		১		
I মা	পপা । দা	-না	সা । মা	পণা । জ্ঞা	-মা	রা II II	
আ	ঘাত্ ক	॰	রো এ	বার্ তা	॰	রে	

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

দেবপ্রয়াগ।—গাড়োয়াল জেলার অন্তঃপাতী টিহরি রাজ্যে গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে দেবপ্রয়াগ অবস্থিত। এখানেও ব্রহ্মকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে ব্রহ্মা সৃষ্টির পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর উত্তরে একটী শিবলিঙ্গ আছে; নদীদ্বয়ের মধ্যে যে লিঙ্গ অবস্থিত, তাহা স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ নামে খ্যাত। নদীসঙ্গমের সন্নিকটে বৈতালিকা শীলা, বেতালকুণ্ড শিবতীর্থ, সূর্য্যকুণ্ড, বশীনাতীর্থ, বারাহতীর্থ, বারাহিশীলা, পৌষমালতীর্থ এবং প্রত্যাম্বস্থল অবস্থিত। উক্ত সূর্য্যকুণ্ডে মেধাতিথি এবং পৌষমালতীর্থে কিন্নরী পুষ্পমালা তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রত্যাম্বস্থলের নিকট বৈত্রপারদ দেবের অবস্থিত। এখানকার গুহায় একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। ইহার অর্দ্ধক্রোশ দূরে গৃধ্রাচলশৃঙ্গের সন্নিকটে বিশ্বতীর্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্যকুণ্ডের উপর ঋষিকুণ্ড, গঙ্গার দক্ষিণতটে সৌরকুণ্ড এবং সঙ্গমস্থলের পূর্ব্বদিকে তুণ্ডীশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। ইহার চার ধনু দূরে দানবতী নদীর সন্নিকটে দানবেশ্বরের মন্দির আছে। দানবতীনদী-সঙ্গমে পাঁচটি বিখ্যাত লিঙ্গ দেখা যায়; যথা বিশ্বেশ্বর, মহালিঙ্গ, ধৌতকেশ্বর, তুণ্ডীশ্বর, এবং দানবেশ্বর। বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গটি রামচন্দ্র দ্বারা স্থাপিত হয়; দেবপ্রয়াগের দক্ষিণে যথায় নবালিকা নদী ভাগীরথীর একটি শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে, তথায় ইন্দ্রপ্রয়াগ-তীর্থ এবং ইন্দ্রকুণ্ড ও ধর্ম্মকুণ্ড অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে

বসুধ তীর্থ, ব্রহ্মধারা এবং ইন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ আছে। নন্দালিকা নদীর পূর্ব্বদিকে ত্রিশূলতীর্থ ত্রিশূল-কুণ্ড ও ত্রিশূলনদী এবং দক্ষিণে উর্দ্ধিকনদী এবং পূর্ব্বদিকে পুনরায় বৈনতেয় নদী দেখিতে পাওয়া যায়। বৈনতেয় নদীসঙ্গমে গড়ুরেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে বিভাবিনী নদী এবং ইহার সঙ্গমস্থলে ভাবেশ্বরী দেবীর মন্দির দৃষ্ট হয়। বাম দিকে সেতু নদী, দক্ষিণে রাজেন্দ্রী নদী এবং তাহাদিগের সঙ্গমস্থলে পৃথ্বীতীর্থ অবস্থিত। পৃথ্বীতীর্থে পৃথু তপস্যা করিয়াছিলেন এবং এখানে পৃথেশ্বর মহাদেবের একটী লিঙ্গ আছে। দক্ষিণে কপিঞ্জল-নদী কপর্দ্দক শৈল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই শৈলটীতে এক শিবলিঙ্গ আছে; পূর্ব্বদিকে চন্দ্রকূট শৈল বিরাজমান। কেহ কেহ ইহাকে চন্দ্রবাদিনী শৈলও কহিয়া থাকেন। এখানেও একটি শিব লিঙ্গ আছে; তাহা দেবেশ্বর নামে খ্যাত। উক্ত মন্দিরের সন্নিকটে চন্দ্রতোয়া নদী প্রবাহিতা; অতঃপর লাঙ্গল-শৈল; এখানে লাঙ্গলেশ্বর মহাদেব আছেন। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে মঞ্জুকুল নদী বিদ্যমান; ইহার সঙ্গম-স্থলে ভীমতীর্থ অবস্থিত। এক ক্রোশ দূরে পূর্ব্ব দিকে পিঙ্গলিক পর্ব্বত মস্তক উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখানে বন-দেবীর মন্দির আছে; অর্দ্ধক্রোশ দূরে পশ্চিম দিকে ধেনু-নদী কলনাদে বহিয়া যাইতেছে। অর্দ্ধক্রোশ দূরে পশ্চিম দিকে ত্রিশূলেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে।

পাণ্ডুকেশ্বর।—গাড়োয়াল-জেলার অন্তঃপাতী মনোনাদক গিরিপথে পাণ্ডুকেশ্বর অবস্থিত। এই স্থানটী যোশীমঠের ঠিক নয় মাইল উত্তরে। এখানে যোগবদ্রির মন্দির আছে। পঞ্চ বদ্রির মধ্যে ইহাও এক বদরি নামে খ্যাত। পাণ্ডবেরা পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পাণ্ডুকেশ্বরে আসিয়া তপস্যা করেন; সেইজন্যই ইহার নাম পাণ্ডুকেশ্বর হইয়াছে; এখানকার অধিবাসীরা ভুটিয়াদিগের সহিত ব্যবসায় করিয়া থাকে। যতদিন যাত্রিগণ এখানে আসে, ততদিন ব্যবসায়টি চলিয়া থাকে। তুষার-দ্বারা পথ রুদ্ধ হইয়া যাইলে লোকে এখানে আর আসে না, তখন ব্যবসায়ও আর থাকে না। কতিয়ুরি-রাজাদিগের কতকগুলি তাম্রশাসন এখানে পাওয়া গিয়াছে।

রুদ্রপ্রয়াগ।—ইহা গাড়োয়াল-জেলায় অবস্থিত। পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে ইহা একটি প্রয়াগ। অন্যান্য প্রয়াগগুলির নাম বিষ্ণুপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ, এবং নন্দপ্রয়াগ। অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থলে বাজার আছে এবং তথায় রুদ্রনাথের মন্দির অবস্থিত। রুদ্রনাথ মহাদেবের অন্য একটি নাম মাত্র। কেদারনাথে যাইবার পূর্ব্বে যাত্রিগণ রুদ্রনাথে সমাগত হইয়া স্নান করে। এইখানে নারদঋষি রুদ্রনাথ মহাদেবের দর্শন-মানসে এক পদে শত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মহাদেবের দর্শন-লাভ করেন; নারদ স্তব-কালে যেরূপ স্বরে মহাদেবের স্তব করিয়াছিলেন, সেই স্বর হইতে মহাদেব রাগরাগিণীর সৃষ্টি করেন। এখানে গোপাল-নামক জনৈক ব্রাহ্মণের খুব খ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। কিংবদন্তীটি এইরূপ;—দেবাশ্রয় নামে একটী ব্রাহ্মণ ছিল; তাহার পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে গোপাল শর্ম্মা ব্যতীত সকলেই পণ্ডিত ছিলেন; গোপাল মূর্খ থাকাতে তাহার যজ্ঞোপবীত দেওয়া হয় নাই। মূর্খের অনাদর

সর্ব্বস্থলেই হইয়া থাকে, সুতরাং গোপালের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। তাহাকে তাহার মাতাপিতা গোচারণের জন্য নিযুক্ত করিল। যৌবন সমুপস্থিত হইলে গোপাল স্বীয় অবস্থা চিন্তা করিয়া মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল। স্বকীয় অবস্থার উন্নতিসাধনে প্রয়াসী হইয়া সে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক কৈলাসে গমন করে এবং নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত কলেবরে রুদ্রপ্রয়াগে আগমন করে। গোপাল যখন রুদ্রপ্রয়াগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তখন তাহার দৃষ্টি পূজায় নিরত একটি ব্রাহ্মণের উপর পতিত হয়। ব্রাহ্মণটি শিবপূজা করিতে-ছিল ; গোপাল শুনিল যে ব্রাহ্মণের মুখ হইতে "ওঁ শিবায় নমঃ" শব্দ উচ্চারিত হইল। গোপাল ও সেই মন্ত্রটী বহুবার আবৃত্তি করিতে লাগিল। তখন মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দর্শন দেন এবং তাহার প্রজ্ঞা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন। তদবধি সে গোপাল সিদ্ধ নামে খ্যাত হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ পরশুরামের সহিত ভোজন না করাতে অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহাদিগকে গোপালই মুক্ত করেন। রুদ্রপ্রয়াগের কিছু উপরে বিশ্বামিত্রের তপোবন আছে। সন্নিকটে বশিষ্ঠকুণ্ড, সূর্য্যশিলা, অত্রিকুণ্ড, গৌতমতপঃস্থল, ভরদ্বাজতপঃস্থল ও ত্রিপুরেশ্বরের লিঙ্গ অবস্থিত।

কেন।

খসিলে পাতাটি কতটুকু ক্ষতি
হয়ে থাকে বিটপীর ?
ফুলটি ঝরিলে শোভা নষ্ট নহে
পুষ্প-অটবীর।

উল্কাটী পাতে ব্যোম নহে কভু
তেজ-দীপ্তি-হারা।
একটি পরাগ বিহনে ধরণী
কেন শূন্য মরুপারা ?

ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

নারীর শিক্ষা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা।

সকল প্রকার জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্তই শিক্ষার প্রয়োজন। কি আধ্যাত্মিক, কি নৈতিক শিক্ষা ভিন্ন মানব জীবনের কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ হইতে পারে না। সূর্য্যোদয় যেমন রজনীর অন্ধকার দূরীভূত করে, মানব-জীবনে শিক্ষাও ঠিক তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া তাহাকে উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। শিক্ষা স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজন। শিক্ষার অভাবে পৃথিবীর অর্দ্ধেক জিনিষ মানুষের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। শিক্ষার গুণেই মানুষ মানুষ হইতে পারে, শিক্ষার অভাবে মনুষ্যত্ব পশুত্বে পরিণত হয়। শিক্ষার বিস্তার যতই অধিক হয় জগতের ততই মঙ্গল।

শিক্ষার প্রথম সোপান হইতেছে বিদ্যালয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের মুখ-দর্শন কয় জন

নারীর অদৃষ্টেই বা ঘটে? জন কতক ব্রাহ্ম-ভগিনী এবং কলিকাতাস্থ সংস্কৃত হিন্দু পরিবার ভিন্ন পুনের আনা সাড়ে তিন পাই নারীই এই অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত। কাজে কাজেই পল্লীনারীগণ তাঁহাদের জীবনের অমূল্য সময়টুকু গৃহকার্য্যের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে—তাহা তাস এবং পরনিন্দা পরকুৎসা লইয়াই অতিবাহিত করিয়া থাকেন, এবং এইরূপে নিজের মনকে ছোট করিয়া তুলেন। কেহ কেহ বা অক্ষর পরিচয় করিয়া বাজে নাটক পড়িয়াও সময়ের অপব্যবহার করেন। বাজে নভেল পড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। ইহাতে মানুষের উপকার না হইয়া অপকারই যথেষ্ট হইয়া থাকে; মন কুরুচিপূর্ণ হইয়া ওঠে। এই জন্যই একটা কথা আছে "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।"

মেয়েদের শিক্ষার জন্য মাতাপিতা প্রধানতঃ দায়ী। তাঁহারা কেবল মেয়েদের বিবাহে কতকগুলি টাকা খরচ করিয়াই মেয়ের প্রতি কর্ত্তব্য পালন শেষ হইল মনে করেন, তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ একবারও কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন না। বরং এই যে বিবাহের সময় কতকগুলি টাকা খরচ করিতে হয়, এই জন্য মেয়ের প্রতি মাতাপিতা এবং আত্মীয় স্বজন সকলেই বিরূপ। বড় দুঃখেই মাননীয়া কবি লিখিয়াছেন—

"ভাই রোদে, করি খেলা,
ঘরে যদি সন্ধ্যা বেলা,
দাদা খায় ছানা বড়া পরম সন্তোষে;
যদি পাই চিঁড়ে মুড়ী,
তবু লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ী,
পিসিমা কাকীমা তবু মোর দোষ ঘোষে।
ইত্যাদি।

কন্যার প্রতি এ ভাবটা বঙ্গের ঘরে ঘরে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন স্থলে মাতাপিতা অনুগ্রহ করিয়া মেয়েকে কার্পেট বুক খানা কিম্বা একটু আধটু গান বাজনা শিক্ষা দিতে মনোযোগী হন বটে, কিন্তু সেটা মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের ফলাফল বিষয়ে আশঙ্কার জন্য নয়, নিজেদেরই সুবিধার জন্য। কেননা আজকার ছেলেরা প্রায়ই অল্প বিস্তর এ সব ভালবাসে, তাই মেয়ের বিবাহের সময় "কম ভুগিতে" হইবে বলিয়াই এটুকু শিক্ষা দেওয়া হয়। তার পর মেয়ের অদৃষ্টে যাহাই থাকুক না কেন। তাহাদিগকে একবার "যেন তেন প্রকারেণ" পাত্রস্থা করিতে পারিলে হয়।

বর্ত্তমান নারী সমাজ যে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহা বর্ণনীয় নয়। নারীর এই নাগপাশের বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য আজ কাল এক দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহারা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিয়া যাহার যাহা খুসি তাহাই বলিয়া যাইতেছেন। কেহ বা জোর করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে চাহিতেছেন। কোন লেখিকা বলিতেছেন যে দুই এক দিনের পদস্খলনকেও তিনি ডরান না, যত ডরান ঐ বাল্য বিবাহটাকে। বাল্য বিবাহ যে কোন মতেই উচিত নয় একথাটা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ঐ 'পদস্খলনে'র কথাটা পড়িয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। "সত্য যুগ" বলিয়া যে একটা পবিত্র যুগের কথা পুরাণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কি সংযম এবং ব্রহ্মচর্য্যের বাহুল্যের জন্যই নহে? মানব জীবনের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য সংযম এবং চরিত্র-গঠন এবং ইহা বিকশিত হইবার

জন্যই শিক্ষা, বিদ্যালোচনা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিধিগুলি সযত্নে গ্রহণ করা। সেই জন্য ভয় হয় এইরূপ লেখিকারা নারীসমাজের কল্যাণ করিতে গিয়া অকল্যাণ করিয়া না বসেন। এ সমস্ত প্রবন্ধ পাঠে তরলমতি তরুণীদের—যাহারা সমাজের নাগপাশে দৃঢ় রূপে আবদ্ধ, তাহাদিগের অন্তরে একটা বলগা-ছাড়া স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগরিত হইয়া বিষময় ফল ফলিতে পারে। তাই বলিয়া বর্ত্তমান নারীসমাজের সংস্কারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতেছি না। বর্ত্তমান নারীসমাজের পরিবর্ত্তন নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়াছে। নচেৎ এরূপ ভাবে আর মান্ধাতার আমল হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে সেই নীতির অনুসরণ করিলে নারীসমাজকে আর ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। শেষে একটা উচ্ছৃঙ্খলতা একটা বিপ্লব অনিবার্য্য। মাতাপিতারা এখন হইতে সাবধান হউন। কন্যাকে এমন শিক্ষাদান করুন্ যাহাতে তাহারা সংযমী ও কর্ত্তব্য-পরায়ণা হইতে পারে। সুশিক্ষায় তাহাদের চরিত্র গঠন করিয়া তুলুন এবং যাহাতে তাহারা পরমুখাপেক্ষিনী দাসীযোগ্যা না হইয়া স্বাবলম্বিনী মহীয়সী নারী হইয়া জীবনযাপন করিতে পারে সেটাও অগ্রে দেখিতে হইবে।

সচরাচর অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় উচ্ছৃঙ্খল পুত্র পিতার কষ্টার্জ্জিত সঞ্চিত অর্থ নানাবিধ কুক্রিয়ায় নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, কিন্তু বিধবা কন্যা আজীবন পিতৃগৃহে থাকিয়া মাতাপিতার সেবা করিয়াও পৈতৃক এক কপর্দ্দকেও বঞ্চিত। মাতাপিতার ইহা কি ভীষণ পক্ষপাতিত্ব নয়? তাঁহারা না দিবেন মেয়েকে শিক্ষা, না করিবেন মেয়ের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়! হতভাগ্য নারীজাতি যেন বিধাতা পুরুষের অভিশাপ মাথায় করিয়া এ পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে! যে সকল সৌভাগ্যবতী নারী স্বামি-পুত্রের উপর নির্ভর করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না; কিন্তু এমন দুঃস্থ সম্ভ্রান্ত মহিলারও অভাব নাই যাঁহাদিগকে পেটের দায়ে পাচিকাবৃত্তি অথবা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। এমন কি উদরান্নের জ্বালায় অনেকঅনেক নারীকে প্রলোভনে পড়িয়া নারী-ধর্ম্মেও জলাঞ্জলি দিতে শুনা গিয়া থাকে। ইহাপেক্ষা সমাজের শোচনীয় অবস্থা আর কি ঘটিতে পারে? নারী কি পিতার কি শ্বশুরের উভয়ের সম্পত্তি হইতেই বঞ্চিত। কাজেকাজেই নিজেদের ভরণপোষণের উপায় করিয়া লইবার পক্ষে তাহাদিগের সকল পথই রুদ্ধ। ইহাতে পিতার বা শ্বশুর কুলের মুখ উজ্জ্বল হয় কি? স্বার্থপর সমাজ অসহায়া নারীকে একটা ক্রীতদাসীরূপে পাইতে চায়, সেই জন্য তাহাদের সকল বিষয়ের উন্নতি বা সুখসুবিধার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এ ভাব আর অধিক দিন বজায় রাখিলে সমাজের বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। এমন স্বার্থপর সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতেই হইবে। শুনিতে পাই কোন যুগে রাজপুতেরা মেয়ে জন্মিলে সূতিকাগারেই তাহাদের শেষ করিয়া দিতেন। বাংলার মাতাপিতারা যদি পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করিতে না পারেন তবে তাঁহারাও সেই পথ অবলম্বন করুন। তাহা হইলে আর কোন বালাই থাকিবে না। আর তাহা না করিলে কন্যাকে সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের

পদে উন্নীত করুন। অগ্রে তাহাদিগকে বিদ্যা-শিক্ষা দিতে হইবে। যাঁহারা কন্যাকে এই শিক্ষার বিদ্যালয়ে পাঠাইতে নিতান্তই অনিচ্ছুক তাঁহারা নিজেরা কন্যার শিক্ষার ভার লউন কিংবা উপযুক্ত শিক্ষক অথবা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিন। তাহাদিগকে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, গণিত প্রভৃতি সকল বিষয়ই কিছু কিছু শিখিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধু মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত, ধর্ম্মগ্রন্থ, আদর্শ-নারী-চরিত্রবিষয়ক পুস্তকও তাহাদিগের পাঠ্য হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদিগের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হয় এবং তাহারা কঠোর সংযমী হইতে পারে। এমনভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে আবশ্যক হইলে তাহারা আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় নিজেরাই করিতে পারে। তাহার পর সূচিকার্য্য গান বাজনা চিত্রবিদ্যা এগুলিও শেখা থাকিলে অর্থোপার্জ্জনের পথ আরও কিঞ্চিৎ সুগম হইতে পারে। সুতরাং এগুলিও অবশ্য শিক্ষ-ণীয়। আজকাল সূতাকাটা এবং তাঁতশিক্ষার প্রচলন হইয়াছে তাহাও শিখিতে হইবে, কেননা জীবনে প্রথম দুইটি সমস্যা হইতেছে অন্ন আর বস্ত্র। নিজের হাতে সূতা কাটিয়া যদি বস্ত্রের অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারা যায় তবে ইহাপেক্ষা সুবিধার বিষয় আর কি হইতে পারে? আমার এই মন্তব্য শুনিয়া অনেক সুখী পরিবারই হয় ত' বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন কেননা—

"চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

হইতে পারে অনেক মহিলার কাম্যস্বাধীনতা হয় ত' কেবল কলেজে এম্-এ, বি এ, পাশ করা, সভা সমিতিতে যোগ দেওয়া এবং পুরুষের সহিত প্রকাশ্য রাজপথে অথবা উদ্যানে ভ্রমণ করা। কিন্তু এরকম স্বাধীনতা লাভে সাধারণের অভাব দূর হইবে না। এটা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে প্রযোজ্য। বঙ্গদেশের মধ্যে হাজার হাজার ভদ্র গৃহের দরিদ্র মহিলা এবং বিধবা বিদ্যমান রহিয়াছেন; তাঁহাদিগের দুর্গতির সীমা পরি-সীমা নাই। দেখিয়া শুনিয়া যে অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করিয়াছি, তদনুসারেই আজ আমি এই মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। এবং আমার বিশ্বাস এইরূপে নারী যদি শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে তবেই তাহাদিগের প্রকৃত দুঃখ কথঞ্চিৎ দূর হইবে। মাতাপিতা এবং অভিভাবকবর্গের এখন কর্ত্তব্য নারীর ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট চিন্তা করিয়াই তাহাদিগের সকল প্রকার শিক্ষায় সুশিক্ষিতা করা। এবং নারীবৃন্দ নিজেরাও নিজেদের শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হইয়া যাহাতে নিজের কথঞ্চিৎ দুঃখ নিবারণে সমর্থ হন তন্নিমিত্ত চেষ্টিত হউন।

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

মিসেস ইঞ্চ্‌বল্ড।

তাঁহার রচনার ভাষা আড়ষ্ট ছিল না। সে ভাষার অনেক স্থলে বাঙ্গের একটি স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। দোষ এবং অন্যায়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বাঙ্গ

করিতেন, মহৎ ব্যক্তি বা বিষয়কে তিনি উপন্যাসের মধ্যস্থল কখনও করেন নাই।

A Simple Story নামক উপন্যাসটিতে তিনি দেখাইয়াছেন উপযুক্ত শিক্ষার ফল ভোগ করিতে না পারিয়া কিরূপে নারী বিপথগামী হইয়াছিল Nature and Art নামক পুস্তকে কয়েকটি অসম্ভব ঘটনা থাকিলেও তাহা চিত্তাকর্ষক, উপদেশপূর্ণ এবং শেষাংশে বাস্তবিকই মর্ম্মস্পর্শী। উচ্চবংশে বিবাহ করিয়া দুর্ব্বল-প্রকৃতি পুরুষ কিরূপে আপনার পূর্ব্বতন দুর্ভাগ্য ও পুরাতন স্নেহ উপকারের কথা ভুলিয়া যায়, অনুশোচনা কিরূপে পাপের শাস্তিদান করে, সরল বালক আপনার অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নের দ্বারা মানব ও সমাজের দোষ কিরূপে প্রদর্শন করে, প্রভৃতি বিষয় পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। বালক জানিতে চাহে হত্যা ও যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য কি? স্বর্গে যখন ধনী দরিদ্রের মধ্যে ভেদ নাই, মর্ত্ত্যে কেন প্রভেদ থাকিবে? ভগবানকে যতখানি শ্রদ্ধা করিতে হইবে ধর্ম্মযাজককে তাহা অপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধা করিতে হইবে কি না। এই উপন্যাসের শেষ ভাগে এগ্‌নেস্ প্রিম্‌রোজের বিচারদৃশ্যটি বড় করুণ। প্রলোভনকারী প্রতারক তথাচ বিচারক। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই অংশ অবলম্বনে 'বিচারক' নামের একটি ছোট গল্প লিখিয়াছেন। বিচারক মোহিতমোহন (বিনোদচন্দ্র) Justice william Norwynne এর দেশী সংস্করণ এবং হতভাগিনী হেমশশী (ক্ষীরোদা) Agnes Primrose এর চরিত্র দৃষ্টে অঙ্কিত। এস্থলে বলা আবশ্যক ইংরাজী উপন্যাসটিতে উক্ত অংশে যে সামান্য ত্রুটিগুলি লক্ষিত হয়, 'বিচারক' গল্পটিতে তাহার একটিও দৃষ্ট হয় না।

তাঁহার জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে একটি গুণ বিশিষ্ট ভাবে লক্ষিত হয়। তিনি নিজ প্রয়োজনে অর্থব্যয় না করিয়া আপনার সাধ্যমত আত্মীয়-স্বজন এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য করিতেন। সামান্য কৃষকের কন্যা হইয়া উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুবিধা না পাইয়া তিনি পুস্তক রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে দেখা যায় গৃহস্বামীর মৃত্যুর পর অনেক সময় একটি সংসার ভাসিয়া যায়; একটী উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির অভাবে একটী সংসারের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না, বিধবা পত্নী ও শিশু পুত্রগণ স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত অবস্থা হইতে একেবারে কঠোর দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর মিসেস্ ইঞ্চ্‌বল্ড আপনার পরিশ্রমের ফলে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং অর্থসঞ্চয় করিতেও পারিয়াছিলেন। তিনি এই সমস্ত বিষয়ে আপনার ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করিয়াছিলেন, অপরের সহায়তার প্রত্যাশা করেন নাই এবং তাহা পান নাই। আপনার অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বনের বলে তিনি জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন।

বিলাতে অধিকাংশ স্থলে পারিবারিক বন্ধন খুব দৃঢ় নহে। সেখানে শৈশব ও বাল্যাবস্থায় পরস্পরের মধ্যে একটি স্নেহের ও প্রীতির টান থাকে; কর্ম্মক্ষম হইলেই সকলে উপার্জ্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত হয় এবং উপার্জ্জনের ফল স্বামী স্ত্রী ও তাহাদিগের অল্প বয়স্ক সন্তানগণ ভোগ করে। ইহার একটি গুণ, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী থাকে না, সকলেই স্বাবলম্বী হইয়া আপনার পায়ে আপনি

ভর দিয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের একান্নবর্ত্তী পরিবারে সকলে এক সঙ্গে অবস্থান করে। সেই জন্য ভারতীয় নরনারীর পক্ষে আপনাদিগের দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করায় কিছু অসাধারণত্ব দেখা যায় না; আমাদের দেশে এরূপ করিলে কেহ বিস্মিত হয় না। ভারতের একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে যে নিবিড় বন্ধন ছিল, নানা কারণে তাহাতে শিথিলতা উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি যদি কোন ব্যক্তিসম্বন্ধে এরূপ কথা শুনা যায় যে তিনি আপনার উপার্জ্জিত অর্থের অংশ পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণের জন্য কিছুই ব্যয় না করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে আপনার স্ত্রীপুত্রকন্যার ভরণ-পোষণে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা সব ক্ষেত্রে তাঁহার আচরণের নিন্দা করিতে সাহস না করিলেও প্রকাশ্যে প্রশংসা করি না। বিলাতে দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনকে সাহায্যদান একটি অসাধারণ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হয়। বিশেষতঃ যদি আপনার অভাব সংক্ষিপ্ত করিয়া, যতদূর সম্ভব কায়ক্লেশে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যদি কেহ উদ্বৃত্ত অর্থ পরিবারস্থ কাহারও অভাব-মোচনের জন্য ব্যয় করেন, তাঁহার প্রশংসা বিলাতের লোকে ত' করিবেনই, আমাদেরও তাহা করা উচিত। আমাদের দেশে ঐরূপ দৃষ্টান্ত ক্রমে দুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছে।

তাঁহার আয় যখন সামান্য ছিল তখনও তিনি এইরূপ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। যখন তাঁহার আয় বৃদ্ধি হইল তখনও তিনি সাহায্য দানে বিরত হন নাই। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিলাসিতায় বা আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয়বৃদ্ধি করেন নাই। অল্প ব্যয়ে যেরূপ গৃহ পাওয়া যায় তাহাতেই তিনি বাস করিতেন; অনেক সময় তাঁহার কোন পরিচারিকা থাকিত না। একটি বাসায় থাকিবার সময় তাঁহাকে নিম্ন হইতে প্রয়োজনীয় জল আনিতে হইত। অন্য একটি বাসায় তিনি একই কক্ষে রন্ধন ও ভোজনকার্য্য সমাধা করিতেন ও সেই কক্ষেই তাঁহার রন্ধন-পাত্র পরিষ্কৃত হইত। এইরূপ অবস্থায় রহিয়া তিনি তাঁহার এক পীড়িত ভগ্নীর জন্য বাৎসরিক বারশত টাকা পাঠাইতেন এবং মনে মনে আরও তিন শত টাকা দিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন কারণ তাঁহার ভগ্নীর অভাব তাঁহার অভাবের অপেক্ষা অনেক বেশী। তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন শীতে আমার খুব কষ্ট হইত, তখন আমি মনে মনে বলিতাম 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার ভগ্নীকে তাহার ঘর হইতে নড়িতে চড়িতে হয় না। প্রত্যেক দিন সকালে তাহার ঘরে আগুনের কুণ্ড জ্বালা হয়, তাহার খাবার তৈয়ারী হইয়া তাহার কাছে পৌঁছে।" বিলাতে দারুণ শীত; সেই জন্য সকালে ও সন্ধ্যায় কক্ষে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিয়া রাখা হয়। মিসেস্ ইক্ বল্ড্ ভগ্নীর যাহাতে কোন কষ্ট না হয় সেজন্য আপনি কষ্টস্বীকার করিয়া তাঁহার আরাম-সুখ বিধান করিতেন। তাঁহার সাতটি ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে কেবল এই ভগ্নীই তখন জীবিত। সুতরাং ভগ্নীর শেষ জীবনে তাহাকে সুখী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

রমণীগণ সাধারণতঃ বেশভূষাপ্রিয়। কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদে সৌখীনতা ছিল না। বিখ্যাত কবি শেলীর পত্নী তাঁহার সম্বন্ধে

বলিয়াছেন যে যদিও তিনি অতি সামান্ত গৃহে অবস্থান করিতেন ও সাধারণ হীন পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন, এবং যদিও বংশ-গৌরব বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না তথাপি তাঁহার আকৃতি ও মধুর প্রকৃতির গুণে ও প্রতিভার বলে তিনি কোথাও অনাদৃত হইতেন না। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, 'গত বৃহস্পতিবার আমি আমার শুইবার ঘর মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিলাম; তখন আমাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্ত দুই-জন সহিস সমেত একটি সম্ভ্রান্ত লোকের গাড়ী দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল।' যাঁহার মনে যথেষ্ট দৃঢ়তা থাকে তিনিই কেবল প্রচুর প্রশংসা ও সম্মানের মধ্যে এরূপে আপনার লক্ষ্য সংযত ও আদর্শ অবিকৃত রাখিতে পারেন।

তিনি একখানি আত্মজীবনী লিখিয়াছিলেন। একজন প্রকাশক তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে পনের হাজার টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। ব্যাপারটি লোভনীয় হইলেও তিনি তাহা প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কেহ বলেন তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কেহ বলেন তাঁহার নির্দ্দেশমতে তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর নষ্ট করা হইয়াছিল।

আটষট্টি বৎসর বয়সে ১৮২১ খ্রীঃ-অব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। সে প্রায় একশত বৎসরের পূর্ব্বেকার ঘটনা।

হারানিধি।

নীরব নিশীথে, তটিনী কূলেতে
কে তুমি দাঁড়ায়ে ওই!
আকুল নয়ান, উদাস পরাণ,
ঘরে যেতে মন নেই।
ব্যাকুল চাহনি দিতেছে জানায়ে
কি যেন হারায়ে গেছে—
কি যেন গো ছিল, কি যেন গো নেই,
শুধু তা'র স্মৃতি আছে।
বুঝি আর তা'রে পাবে না জীবনে,
গেছে সে জীবন-পার—
নয়নের জল রেখে গেছে শুধু,
বুক-ভরা হাহাকার।
তাই এ নিশিতে, খুজিয়া তাহারে
ক্লান্ত হৃদয় ল'য়ে,
তটিনীর কোলে বিরাম লভিতে
আসিয়াছ ওগো ধেয়ে!
যাও ফিরে যাও সে যে গো তোমার
ভিতর বাহির ভরা,
হৃদয়-মাঝারে লভিবে তাহারে
(হ'য়ে) প্রেমেতে আপনা হারা।

শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরী দেবী।

বিধির বিধি।

সে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল; চাটুর্য্যে মহাশয়ের কিন্তু প্রভাতে আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না। অন্য অসুখ কিছুই নয় কেবল পক্ষাঘাতের রোগীর মত হাত পা যেন অবসন্ন। আর এক উপসর্গ, মেয়েটার দিকে চাহিলেই বুক ফাটিয়া কান্না আসে। প্রভার মার মেয়ের জন্য দুঃখ কষ্ট বুকজোড়া হইলেও সে-কষ্ট প্রকাশের আর অবসর মিলিল না। তিনি বিপন্ন স্বামীকে লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

প্রাতে প্রতিবেশীরা এক এক করিয়া বিবাহ-বাড়ী আসিতে লাগিল। আর কিছু না হ'ক নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এ-সংবাদ লইবার একটা কৌতূহল সকলেরই ছিল। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কর্ত্তাকে প্রশ্ন করিলে তিনি নীরবে ললাট স্পর্শ করেন, কোন উত্তর দেন না। প্রভা ম্লানমুখে স্থান ত্যাগ করে। কেবল গৃহিনী স্বল্প কথায় জানাইয়া দেন যে রাত্রে বর আসিয়া বিবাহ করিয়া গিয়াছে। চাটুর্য্যে মশায়ের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন একমাত্র সন্তানের শুভকার্য্যে এরূপ বিপত্তি হওয়ায় ব্রাহ্মণের মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিয়াছে। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, 'ধাক্কাটা সামলালে হয়।'

মা আজ আর পিতার নিকট হইতে ওঠেন নাই; প্রভা দুটি রাঁধিয়া জোর করিয়া মাতা পিতাকে খাওয়াইয়াছে। নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে তখন কর্ত্তা গৃহিনী দুজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। প্রভা ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দাঁড়াইল। গতরাত্রে এইখানেই তাহার বিবাহ হইয়াছে। প্রভা বালিকাটি নয়; কাল রাত্রে যাহার হাতে সে তাহার ইহ-জীবনের যাহা কিছু সব তুলিয়া দিয়াছে তাহারই কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে হইতেছিল। বিবাহ যে ভাবেই হোক তবু এই তার জীবনের সাগর-সঙ্গমের প্রধান তীর্থ-স্থান। চণ্ডীমণ্ডপের সেই স্থানটুকুর মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভা ভাবিতেছিল, 'এইখানে আমি বসেছিলাম আর এই খানটিতেই বোধ হয় তিনি বসেছিলেন। ঠিক এই খানেই বটে।' প্রভা খানিক সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে স্থানটির দিকে চাহিয়া রহিল, বুঝি সেখানে যিনি বসিয়াছিলেন তাঁ'র রূপের প্রভা তখনও সেখানে জ্বলিতেছিল। তারপর মনে পড়িল কেমন করিয়া আকুল ভাবে তিনি প্রভার দিকে চাহিয়াছিলেন। সে দৃষ্টি মনে পড়িতেই সেই নির্জ্জন স্থানেও লজ্জায় প্রভা আরক্তমুখী হইয়া উঠিল। তারপর সেই স্পর্শ! কি কোমল! কি শীতল! কি মোহকর! নারী-জীবনের কি সর্ব্ব সার্থকতা সেই স্পর্শ! প্রভা নিজের হাতখানি একবার তুলিয়া ঘুরাইয়া দেখিয়া লইল—এখনও বুঝি হাতে সেই স্পর্শ-বিহ্বল সুখ অনুভব হইতেছে। প্রভার অঙ্গের মধ্যে এই হাতখানিই আজ শত ধন্য। তাঁর জীবনারাধ্যের সবটুকু দান শুধু এই হাতখানিই অধিকার করিয়াছে। একবার বড় সাধ হইল বক্ষে, মাথায়, সর্ব্বাঙ্গে একবার এই হাতখানি বুলাইয়া সেই প্রিয়-স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া লয়। স্থান জন-শূন্য, তবু তাঁ'র ভয় হইল পাছে কেহ দেখিয়া

১০২৮

ফেলে। নিজের হাত নিজের অঙ্গে স্পর্শ করাইতেও লজ্জাভয়ে গাত্র শিহরিয়া উঠিল। হায় অবোধ মন!

সুরেন যেখানে আহত হইয়া পড়িয়া যায়, মাথার রক্তের দাগ তখনও সেখানে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। প্রভা সেখানে গিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া চারিদিকে একবার চাহিল, তারপর চুলের রাশি এলো করিয়া সেই স্থান-টুকু ধীরে ধীরে মুছিয়া লইল। তাহারই আশে পাশে যদি একটু পায়ের দাগ কি অন্ত কোন চিহ্ন দেখিতে পায়, সেই লুব্ধ আশায় চাহিতে চাহিতে কোণের কাছে হীরকোজ্জ্বল অঙ্গুরীয়ের দীপ্ত প্রভায় তাহার চক্ষু পড়িল। সে ত্বরিত-হস্তে তাহা কুড়াইয়া দেখিল, আংটি তাঁরই বটে। সম্প্রদানের সময় তৃষিতের বারিপানের মত প্রভা সেই হাতখানির সমস্ত সৌন্দর্য্য শুষিয়া শুষিয়া পান করিয়াছে। এ আংটি তো সে ভাল করিয়াই চেনে। যে দেবতা স্বপ্নেরই দেবতার মত জাগরণের কোন সম্বল না রাখিয়া, প্রভাকে একান্ত নিরুপায় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁর নিজেরও অজ্ঞাতে প্রভার জন্ম এ যে জীবন-ভরা সম্বল দান করিয়া গিয়াছেন! প্রভা লুকাইয়া একবার ওষ্ঠে ঠেকাইয়া অঙ্গুরীয়টি বাম হাতের আঙ্গুলে পরাইল; কল্পনায় এ হাতখানি আর একখানি হাতে রূপান্তরিত করিয়া বার বার ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু আংটিতে এ নাম কার?—"সুরেন্দ্রনাথ"! প্রভার বিশ্ব এইবার বিচলিত হইল। কে এ দেবতা? প্রভা জানিত যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইল, সে সুধীর। কিন্তু এ তবে কে? বিবাহকালে বর কখন অপরের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পরিয়া আসে না।—প্রভার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া এই সময় বাহির হইতে ডাক আসিল, "চাটুয্যে-মশাই বাড়ী আছেন কি?" প্রভা উত্তর দিল, "কে?" যে ব্যক্তি প্রবেশ করিল, সে এই গ্রামেরই একজন গোয়ালা। প্রভা প্রথমে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া বলিল "তুমি কে গা?" "আমি রমণ ঘোষ গো। তুমি তাঁর মেয়ে বুঝি। দিদি-ঠাকরুণ, কর্ত্তাকে একবার খবর দাও।" "তিনি তো বাইরে আস্‌তে পারবেন না, তাঁর অসুখ যে! আচ্ছা দেখি যদি তিনি জেগে থাকেন, তাঁর কাছেই তোমায় নিয়ে যাই।"

প্রভা ও রমণ ঘোষের কথাবার্ত্তায় কর্ত্তা জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রভা গৃহে প্রবেশ করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলি?" প্রভা রমণ ঘোষের পরিচয় দিয়া তাহাকে গৃহে উপস্থিত করিল। জোড়-হস্তে প্রণাম করিয়া রমণ ঘোষ বলিল, "আমার বড় মেয়ের নৈহাটিতে দিয়েছি, কি-না, তাই সেখানে মেয়ে রাখ্‌তে গেচ্‌নু। আমি এই গাঁয়ের লোক শুনে আপনার হবু, কুটুম্বরা আমায় ডেকিয়ে এই চিঠি দেলেন, কি বরাত, ঠাকুর! আপনার জামাই বেহাই দুই-ই মারা গেছে।" শ্রোতা তিনটি প্রাণীই বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। প্রভার মা চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "বলিস্‌ কি! তা' হ'লে কি ঠেঙ্গিয়েই বাছাকে আমার মেরে ফেল্লে?" "না, মাঠাক্‌রেণ! দুজনেরই ভেদ-বমি হয়েছিল। চিঠি পড়ে স্থাখেন্ না।" প্রভার মা তাহার হাত হইতে পত্র লইয়া কর্ত্তাকে দিলেন। রমণ ঘোষ এ-অবসরে প্রস্থান করিল। দুর্ম্মুখের ভার লওয়া কি

কষ্টকর, যাহার উপর কখন পড়িয়াছে, সেই জানে।

পত্র পড়িয়া মহেশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন "সন্ধ্যাবেলা কাঁচড়াপাড়ায় দু'জনের মৃত্যু হইয়াছে! তবে এরা কা'রা—?" ঘটনা শুনিয়া প্রভার মাও স্তম্ভিত হইলেন। উত্তেজনার অন্ত হ্রাস হইলে ব্রাহ্মণ অবশভাবে শয্যায় এলাইয়া পড়িয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "গিন্নি! সুখ-শান্তি মান-মর্য্যাদা তো গিয়াছেই, জাত-কুলও গেল! এত দুঃখেও জান্‌তাম সৎকুলে সৎ-পাত্রেই কন্যা-সম্প্রদান করিছি। এ কোন্ প্রতারক আমার এ সর্ব্বনাশ করে গেল? প্রভা রে তোর কি কর্‌লাম!" দুঃখে ব্রাহ্মণের কণ্ঠরোধ হইল। গৃহিণী প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন। প্রভা আংটি-পরা হাতখানি চোখের কাছে ধরিয়া বারবার নামটি পড়িতে লাগিল,—"সুরেন" "সুরেন"।

(৭)

গ্রামের লোকের নিকট কোন ঘটনাই অবিদিত রহিল না। প্রবঞ্চকের প্রতারণা ও অজ্ঞাত-কুলশীলের হস্তে প্রভাকে সমর্পণ করা লইয়া গ্রামে খুবই আন্দোলন পড়িয়া গেল। চাটুয্যে-ম'শাই এ-অপরাধ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না; সমাজে তাঁহাকে এক-ঘরে হইতে হইল। বিবাহ-ঘটিত মনস্তাপ সামলাইয়া একদিন যদিও তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা-প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, সমাজে চিরদিন সম-স্থানে অবস্থান করিয়া আজ তাহা-কর্ত্তৃক এরূপ অপমানিত হওয়া তাঁহার প্রাণে সহিল না। তিনি বাহিরে আসা বন্ধ করিয়া দিন-রাতই প্রায় শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। আহারনিদ্রাও প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, ভীরু হইলেও মান-সিক সংগ্রামে পুরুষ যখন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহারা তখন প্রায়ই অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়া থাকে। যতক্ষণ তাহাদের জন্য একখানি বিশাল হৃদয় ও দুটি বলিষ্ঠ বাহু সর্ব্বদা রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে, ততক্ষণ তাহারাও একান্ত নির্ভরে সেই আশ্রয়-মাত্র-অবলম্বনে নিশ্চেষ্ট থাকে। কিন্তু সেই মহান্ আশ্রয় যদি কোন দিন পতনোন্মুখ হয়, তখন সেই দুর্ব্বল লতাই চিরদিনের সুপ্ত শক্তি জাগাইয়া তুলিয়া নিজের চিরাশ্রয়কেও আশ্রয় দিবার স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রভার মার সব চেষ্টাই বৃথা হইতে লাগিল। জল-সেচনে বজ্রদগ্ধ তরুর জীবনের সম্ভাবনা কোথায়?

এই সময় ভাগ্য আরও এক স্তর নামিয়া আসিল। চাটুয্যে-মহাশয়ের এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও তিনি জীবিত রহিলেন; কিন্তু তিন দিনের জ্বরে সহসা প্রভার জননী দেহত্যাগ করিলেন। প্রভার বিবাহ-কাল হইতে এ-পর্য্যন্ত তাঁর মনে যাই হোক্ মুখে তিনি কোন দিন কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। মৃত্যুকালেও যখন প্রভা মা'র গলা ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মাগো! আমায় কোথায় রেখে যাচ্ছ?" মা তখন দুইহাতে প্রাণা-ধিকাকে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ভয় কি মা! আমি গঙ্গার কোলে নিশ্চিন্ত হয়েই যাচ্ছি। ও'র কাছে গীতার শুনেছ তো, ভগবান্ নিজে বল্‌ছেন,—ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, সাহ-সীর সাহস, তেজস্বীর তেজ, রূপবানের রূপ সবই স্বয়ং তিনি। যেখানে বা যা'তে যে কোন সদ্‌গুণ বা সৌন্দর্য্য অধিক দেখ্‌বে, সেখানেই জান্‌বে তিনি বিশেষরূপে প্রকাশ

হয়েছেন। প্রভা! জামাইয়ের আমার শিব-তুল্য রূপ! যাঁ'র দেহে অত রূপ তাঁ'র দেহও ভগবানের বিশেষ আসন জান্‌বে। তার ওপর সে নাস্তির সাহস, ধর্ম্মজ্ঞান, সে তো তুমি নিজেও দেখেছ মা! আর এই মৃত্যুকালে যদি আমার একটুও দিব্য জ্ঞান হ'য়ে থাকে, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমার সিঁথির সিঁদুর উজ্জল হ'য়ে জ্বলছে। ক্রুর্দ্ধেরা যাই করুক্‌, তাঁ'কে প্রাণে মারতে পারে নি। প্রভা রে! যে ভগবান্‌ তাঁকে তোমার আশ্রয় ক'রে মিলিয়ে দিয়েছেন, তিনিই তোমাকে তাঁর চরণে পৌঁছে দেবেন। তুমি কেবল একমনে সেই স্বামীকে পূজা ক'রো, তাঁকে পাবেই পাবে।"

চাটুয্যে-ম'শাই উপস্থিত সমাজে ঠেলা হইলেও এই বিপদের দিনে গ্রামের লোক সব ভুলিয়া তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাই মাতার মুখাগ্নি করিয়া আসিল। চাটুয্যে-ম'শাই অপুত্রক, সুতরাং প্রভাই একমাত্র চতুর্থীর পিণ্ড-দানে অধিকারী। কিন্তু করায় কে? গ্রামের পুরোহিত নাই; থাকিলেও তিনি করাইতেন কি না সন্দেহ। এক শিবহাটে ভট্টাচার্য্য-বংশীয়েরাই এ অঞ্চলের প্রায় সব গ্রামেই পুরোহিতের কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারাই কি প্রভাকে চতুর্থী করাইতে রাজী হইবেন? ব্রাহ্মণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পল্লীগ্রামের নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুর কাছে প্রেতের পারলৌকিক-ক্রিয়া সম্পাদিত না হওয়ার তুলনায় ইহকালের সর্ব্ব প্রকার-দুঃখ-কষ্টই অতিতুচ্ছ। যাহা হউক্‌, শত সংশয় সত্ত্বেও চাটুয্যে-ম'শাই একজন প্রজাকে দিয়া হরকুমার ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এককালে ইঁহারা একত্রে টোলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সেজন্য পূর্ব্বের বন্ধুতাও যথেষ্ট ছিল।

এই-দুঃখ-শোক-দুর্দ্দিনের মধ্যে যখন বহুকালের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অপর সকলের মত দূরে না গিয়া, চিরদিনেরই মত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বন্ধুর এই সহৃদয়তা বুক হইতে সজোরে অনেক ব্যথা টানিয়া আনিতে লাগিল। আঘাতে আঘাতে লোকের বুকের পরতে পরতে যে ব্যথা সঞ্চিত হয়, তাহা সমব্যথিতের দর্শনে এক নিমেষেই বুক তোলপাড় করিয়া বাহির হইতে চাহে। আকাশের ঝড় বৃষ্টির মত মুখের ভাষা ও চোখের জল বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া তোলে।

শোকাবেগ একটু প্রশমিত হইলে প্রভার চতুর্থীর কথা উঠিল। যদি পারলৌকিক-ক্রিয়ার অভাবে নিতান্ত নিরাপরাধা ধর্ম্মপ্রাণা সাধ্বীর ঊর্দ্ধগতির বিঘ্ন হয়, ইহা ভাবিয়া ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। আশ্বাস দিয়া হরকুমার বলিলেন, "স্থির হও, আমি যখন আসিয়াছি, তখন আর এত ভাবনা কিসের?"

হরকুমার ঠাকুর পৌরহিত্য করিতে তো স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু চতুর্থীর উদ্যোগ হয় কিসে? প্রভার মাতা-পিতার সোণারূপা যা কিছু ছিল, প্রভার বিবাহের আয়োজনে সে সবই একত্র করিয়া প্রতারকের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। রুগ্ন পিতার ঔষধ-পথ্যের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিয়া যা'ছুই এক পয়সা এ-দিকে ও-দিকে ছিল, সেদিনের বিপদে সে-সবও খরচ হইয়া গিয়াছে। ঘরে মাত্র আহারীয় দ্রব্য যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা দিয়া তো বাজারে কোন জিনিষই কিনিতে পাওয়া যাইবে না। প্রভা পিতার পার্শ্বে বসিয়া মলিন-বদনে এই

কথাই চিন্তা করিতেছিল। তাহার অন্থপায় চিন্তা-স্রোত বারবার আঙ্গুলের আংটির উপর আসিয়া আঘাত করিতেছিল। সে ভাবিল, "এইটাই তা হ'লে বিক্রয় করিব।" কিন্তু এই চিন্তায় প্রভার তরুণ হৃদয় বেদনায় টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিতেছিল। যে তাহার এই জীবনের সর্ব্বস্ব অথচ সমস্ত জীবনেও যাহাকে পাইবে কি না সন্দেহ, তাহারই একমাত্র স্মৃতিটুকু তাহার নিজের হৃৎপিণ্ড অপেক্ষাও ব্যথার জিনিষ। কিন্তু এই একটি উপায় ছাড়া মায়ের চতুর্থীর আর তো কোন পথই নাই। যদি এতই সহিয়াছে, এটাই আর সহিবে না? প্রভা মরিয়া হইয়া আঙ্গুলের আংটি খুলিয়া পিতার হাতে দিয়া বলিল, "বাবা এইটা বেচিলে কোন রকমে চতুর্থীর জোগাড় হইতে পারিবে না?" পিতা কন্তার হাত হইতে আংটি লইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তাই তো! বেশ্‌ ভারী আংটি তো! একখান হীরেও যে বসান আছে! এ তুই কোথায় পেলি, প্রভা?" পিতা আংটির দিকেই চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ভট্টাচার্য্য-মহাশয় লক্ষ্য করিলেন এই প্রশ্নে প্রভার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে ললাটের বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মরেখা অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে বলিল, "এটী আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে কুড়িয়ে পেয়েছি, বাবা!" "চণ্ডীমণ্ডপে? কবে পেলি?" প্রভা নতমস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, "তার পর দিন।" হাতের আংটি ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিয়া পিতা উত্তর করিলেন, "সেই নরাধমদের কেউ ফেলে গেছে, দেখ্‌ছি। না, তাই হক! আমার স্ত্রীর চতুর্থীর আর আবশ্যক নাই। প্রভা! ও আংটি তুমি কেন এতদিন আমার গৃহে রেখেছিলে? সেই মুহূর্ত্তেই ও পাপার্জ্জিত ধন জলে নিঃক্ষেপ করাই তোমার উচিত ছিল।" প্রথমে বার দুই কথা কহিতে গিয়া প্রভার ওষ্ঠ কাঁপিয়া থামিয়া গেল। শেষে একটু বিশেষ চেষ্টায় মুখ খুলিয়া প্রভা বলিল, "সম্প্রদানের সময় ওই আংটি হাতে দেখেছি!" লজ্জায় প্রভা থামিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় ততক্ষণে আংটি-টি তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভিতরে একটা নাম লেখা রয়েছে না? দেখ্‌ তো প্রভা!" বলিয়া প্রভার দিকে আংটি বাড়াইয়া দিলেন; প্রভা কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিল না বা আংটি লইল না। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় অগত্যা চস্‌মা বাহির করিয়া পড়িলেন, "সুরেন্দ্র নাথ"; পরক্ষণেই চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন "একি! আমাদের সুরেন না-কি?" চাটুয্যে-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "চেন না কি? কে বল দেখি?" "যার হাতে ছিল, সে কে, তা' অবশ্য জানি না; কিন্তু যার এ আংটি, সেই যদি হয়, তা'হ'লে জান্‌বে তোমার জামাতা যে সে নয়,—জমীদার রাধাকান্তের একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ।" বিস্মিত মহেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আংটি তুমি ঠিক্ জান?" "প্রায় ঠিকই জানি; কেন না, তা'র উপবীতের সময় এই আংটি প্রস্তুত হয়, আমি হাতে ক'রে তা'কে পরিয়ে দিই। তবে এ যাবৎ এ আংটি তা'রই আছে কি অপহৃত হয়েছে, তা অবশ্য আমি বল্‌তে পারি না। বন্ধু! এ আংটি আমায় দাও, আমি একবার অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌তে চাই। প্রভার চতুর্থীর ব্যয় এখন আমারই উপর থাক্।"

"কিন্তু দেখো যেন তারা এ-বিষয়ে কিছু না জানতে পারেন। প্রস্তাব না হ'বার খুবই হয়েছে—এর উপর লোকে যদি আবার কিছু বলে, আমাদের মর্ম্মান্তিক হবে।" "না তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো।"

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

স্মরণে।

নীরব নিথর চাঁদিনা নিশীথে
একটু গাহিব গান!
বীণার মাঝারে আজিকে আমার
উঠুক্ একটু তান!
প্রকৃতির আজি সাম-ঝঙ্কার
আসুক্ বিশ্বে নামি!
দখিণ-পবন চুপি চুপি দিক্
শান্তি-বারতা আনি!"

কোকিল, তুমি গো কোকিলার সনে
গাহিছ মধুর গান;
বিরহীর প্রাণে বিরহ-বেদন
শুধুই করিছ দান!
(আজি) স্মৃতিখানি কা'র জাগিল সহসা,
ঝরিল নয়ন-লোর!—
ভুলিতে না পারি সে-মুরতিখানি,
স্মরিব জীবন ভোর!

শ্রীমতী মনোরমা দাসী।

মধুর চাষ।

"মক্ষিকা সামান্য প্রাণী কিন্তু তারে শ্রেষ্ঠ মানি।"

চাকের অধিবাসী।—একটী মৌচাক পরীক্ষা করিলে আমরা তাহাতে তিন জাতীয় মক্ষিকা দেখিতে পাই। (১) একটী রাণী (Queen) স্ত্রীজাতীয় মৌমাছি, (২) গুটিকয়েক পুরুষ মক্ষিকা (Drone) ও (৩) অসংখ্য না-পুরুষ না-স্ত্রী কার্য্যকারক মক্ষিকা (Workers)।

১। রাণী।—এই একটী মাত্র রাণীই মৌচাকের জীবন। প্রত্যেক চাকেই একটীর অধিক রাণী থাকিতে পারে না। রাণীর কাজ কেবলমাত্র বংশবৃদ্ধি করা। একদিনে ইনি ৩০০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়িতে পারেন এবং যতদিন মৃত্যুমুখে পতিত না হন, ততদিন তিনি এইরূপ ডিম পাড়িতে থাকেন। এই একটী রাণী তাঁর সারা জীবনে কোটী কোটী মক্ষিকার জন্মদান করেন; সেজন্যই তিনি চাকের প্রাণ। রাণীর আকার, গঠন ও রং অন্যান্য মক্ষিকা অপেক্ষা বিভিন্ন। ইনি আকারে সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা। এজন্য সহজেই চাকের মধ্যে রাণীকে চিনিতে পারা যায়। ইহার গঠন অতি-সুকোমল ও বর্ণ গাঢ়। ইহার জীবনে একবার মাত্র পুরুষের সহিত মিলন প্রয়োজন হয়, এবং ঐ জন্যই কয়েক ঘণ্টার নিমিত্ত তিনি চাক ছাড়িয়া বাহিরে যান; পরে সারাজীবন তিনি ডিম্ব প্রসব করিতে থাকেন, এবং আর তাঁহাকে চাক ছাড়িতে দেখা যায় না। অন্য সময়

রাণী চাক ছাড়িলে বুঝিতে হইবে, যে আর তিনি সে চাকে ফিরিবেন না; তখন অন্যান্য চাক-বাসীরাও চাক ছাড়িয়া তাঁহারই সন্ধানে ছোটেন। রাণী হইলেও ইনি কিন্তু চাকের কর্ত্রী নন্। চাকের মধ্যে তিনিই একমাত্র স্ত্রীজাতীয়-মক্ষিকা বলিয়াই তাঁহাকে রাণী বলা হয়। চাকের সকল জাতীয় মক্ষিকা অপেক্ষা রাণীই দীর্ঘায়ু এবং তিনি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন। চাকের মধ্যে রাণীর চালচলন বাস্তবিকই রাণীর ন্যায়। তাঁহার অসংখ্য পুত্রের মধ্যে যখন তিনি ঘুরিয়া বেড়ান, তখন তাঁহাকে পুত্রবৎসলা কোটী পুত্রের জননী বলিয়াই বোধ হয়।

২। পুরুষ-মক্ষিকা (Drone) দেখিতে একটু মোটা ও ভারী। রাণীর ন্যায় অত লম্বাকৃতি না হইলেও ইহারা কার্য্যকারী মক্ষিকাদিগের অপেক্ষা আকারে দীর্ঘ এবং সর্ব্বদাই শব্দ করে। ইহাদের আয়ু খুবই কম। নিজেদের আহার-সংগ্রহের ক্ষমতা নাই ও ইহাদের জীবন পর-মুখাপেক্ষী। পুরুষ মক্ষিকার কার্য্য কেবলমাত্র রাণীকে বিবাহ করা; সেইজন্যই ইহাদের জন্ম ও এই নিমিত্তই তাহাদিগকে চাকে থাকিতে দেওয়া হয় ও তাহাদের ইচ্ছামত চাকের সঞ্চিত মধু খাইতে দেওয়া হয়। তাহাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইলেই তাহারা আপনা হইতে মরিয়া যায় এবং যাহারা না মরে, তাহাদিগকে চাক হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। তখন তাহারা আশ্রয়শূন্য অবস্থায় না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়।

৩। কার্য্যকারী মক্ষিকা (worker)।— চাকের আসল মালিক ইহারাই। আকারে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, দেখিতে রাণীরই মত কিন্তু অপরিপুষ্ট। ইহাদের জীবন অল্পদিনের জন্য কিন্তু সেই স্বল্প জীবনই কি গভীর কর্ত্তব্যভারে পূর্ণ। মোম প্রস্তুত করা, চাক নির্ম্মাণ করা, ফুলের মধু ও রেণু আহরণ করা, রাণী ও ছোট ছোট বাচ্ছাদিগকে খাওয়ান, চাক পরিষ্কার করা, চাক পাহারা দেওয়া, ডিম ফোটান, মধু সঞ্চয় করিয়া ভাণ্ডার বদ্ধ করা প্রভৃতি চাকের অসংখ্য কার্য্য এই শ্রমিকদিগের উপরই ন্যস্ত। বসন্তের প্রথম আবেশে যখন পৃথিবী নব-পত্র-পুষ্পে শোভিতা হইয়া সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করে, তখনই এই ক্ষুদ্র জীবের কর্ত্তব্য-কার্য্যের আরম্ভ। তখন যেন তাহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না। পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গুন্ গুন্-শব্দে উড়িয়া যাইয়া নিজেদের যতখানি বহিবার ক্ষমতা, সেই পরিমাণ মধু ও রেণু সংগ্রহ করিয়া ছুটিয়া চাকে সঞ্চিত খাদ্য রাখিয়া যায়, আবার পুষ্পে পুষ্পে মধু ও রেণু সংগ্রহ করিয়া আবার রাখিয়া আসে। এইরূপে যতক্ষণ দিনের আলোক থাকে ততক্ষণ অবিশ্রান্ত অসংখ্যবার যাতায়াত করে এবং কোন সময় হঠাৎ ক্লান্তদেহে পড়িয়া মরিয়া যায়। ইহাদের আয়ু এক সপ্তাহ হইতে ২।৩ মাসের অধিক হয় না। যাহারা গ্রীষ্মের প্রথমেই জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সেই সময়ের গুরু পরিশ্রমে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং যাহারা শীতের প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করে তাহারা শীতের কয়মাস বিশ্রাম পায়; সেইজন্য তাহাদের জীবন ২।৩ মাস-কাল-স্থায়ী হয়। এই ক্ষুদ্র মক্ষিকাদের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, কঠোর শ্রমশীলতা, স্বার্থত্যাগ ও অধ্যবসায় ইহাদের গভীর কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পরিচায়ক ও মানবের শিক্ষণীয়।

বসন্তের প্রারম্ভে একটি সাধারণ সুগঠিত মৌচাকে, একটী রাণী, ২০০।৩০৪ পুরুষ মক্ষিকা ও ৫০,০০০ হইতে ৬০,০০০ কার্য্যকারী মক্ষিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিন জাতীর মক্ষিকার মধ্যে কেবলমাত্র কার্য্যকারী মক্ষিকাদেরই মধু আহরণের ক্ষমতা আছে, ও অন্য দুইজাতির মক্ষিকা ইহাদের মুখাপেক্ষী ও ইহাদের আহৃত মধু পান করিয়াই জীবন-ধারণ করে।

সোণার হার।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মধুরাও বন্দী হইলে পর দুর্গ বাহমনী-সেনার হস্তগত হইল। দুর্গের যে কক্ষে তন্নুরাও মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন, ফিরোজ শাহ্ ও খান্‌খানান্ আহমদ্ কয়েক দিন পরে তাহার অভিমুখে যাইতেছিলেন। ফিরোজের মুখ বিষণ্ণ। গত দিবস শাহ্‌জাদা হাসান পিতার সহিত দর্শন-লাভের জন্য সিরুগুপ্পা হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভাতেই পুনরায় প্রস্থান করিয়াছেন। হাসানের প্রস্থানের কারণ আহমদ্ জানিতেন, সেইজন্য ভ্রাতার চিত্তে প্রফুল্লতা-সম্পাদনের প্রয়াস পাইতে সাহস করিতেছিলেন না।

ক্রমে তাঁহারা কক্ষে আসিলেন। ভিত্তি-গাত্রে তন্নুরাওয়ের অসি ও চর্ম্ম ঝুলিতেছিল। বীর যুবকের মৃত্যু-কাহিনী শুনিয়া ফিরোজ সে-গুলিকে স্থানান্তরিত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নিষেধের অন্য একটি কারণ ছিল। সেই কক্ষে সেই শয্যায় আহত দণ্ডনায়ক মধুরাও শায়িত। শরীর দুর্ব্বল, তবে জীবনহানির আশঙ্কা ছিল না। প্রথমে সুলতান মধুরাওকে তাঁহার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া নাগরাও-য়ের সংবাদ দিলেন। তিনি হাসানের নিকট হইতে সে-সংবাদ পাইয়াছিলেন। ফিরোজ বলিলেন, "আপনার পুত্র এখনও সুস্থ হয় নাই, তথাপি সে আপনার ও তাহার অগ্রজের সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুল। আপনার সন্তান বীর হইলেও তাহার চিত্ত শিশুর ন্যায় কোমল, রমণীর ন্যায় স্নেহময়।" নিজের অজ্ঞাতসারে ফিরোজের বক্ষ হইতে একটি উষ্ণ নিঃশ্বাস বাহির হইল।

মধুরাও বলিলেন, "বৃদ্ধের অস্থিরতা মার্জ্জনা করিবেন, সুলতান! তাহা হইলে সে ইচ্ছা করিয়া দুর্গ সমর্পণ করে নাই।" সুলতান বলিলেন, "আশ্বস্ত হউন, দানায়েক! পূর্ব্বেই ত' বলিয়াছি, যখন আমার সেনা দুর্গে প্রবেশ করিল তখন সে দুর্গদ্বারে অজ্ঞান-অবস্থায় লুণ্ঠিত। জয়-পরাজয় খোদার ইচ্ছা। ভীরুতার জন্য মানুষ নিজে দায়ী। সে কাপুরুষ হইলে তাহার প্রসঙ্গ তুলিতাম না। কাপুরুষকে আমরা ঘৃণা করি। আপনার পুত্রের বীরত্বে কলঙ্কের লেশ নাই।"

মধুরাওকে নীরব দেখিয়া ফিরোজশাহ্ বলিতে লাগিলেন, দানায়েক্ মধুরাও! আপনি অচিরে সুস্থ হইবেন। তাহার পর আপনি মুক্ত। বিজয়-

নগরে ফিরিয়া ইচ্ছা হয়, যুদ্ধ করিবেন। আমার ইচ্ছা সন্ধি স্থাপিত হয়। যুদ্ধে ভীত নহি। চিরজীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটিয়া গিয়াছে। রায়-চূড়ের তোয়াব্ নররক্তে উর্ব্বর হইয়া উঠিতেছে। যৌবনের ঘটনা আমরা কেহই ভুলিতে পারি না। তবে মনে হয়, হিন্দু-মুসলমান দুই ভাই-এর মত দক্ষিণে বাস করিলে বড় সুখের হয়।" উপাধানে ন্যস্ত শির আন্দোলিত করিয়া মধুরাও বলিলেন, "তা' হইবে না।" তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া আহ্‌মদ্ পার্শ্বদেশ হইতে বলিলেন, "তা' হইতে পারে না।" বলিয়াই খান্‌খানান্ অপ্রস্তুত হইলেন। ফিরোজ বলিলেন, "শান্ত হও ভাই! এখনও আমি এই শীর্ণ-হস্তে বাহমনী-রাজ্যের রাজদণ্ড চালনা করিতেছি। দানায়েক! আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা সন্ধি হয় এবং আমার অনুরোধ আপনি এই সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যান্। অবশ্য আপনাকে প্রস্তাব লইয়া যাইতেই হইবে, এরূপ কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। আপনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া বিবেচনা করিয়া আপনার মতামত জানাইবেন।"

বয়স হইলে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। ফিরোজের চিত্ত অস্থির ছিল, সেইজন্য তিনি মধুরাওয়ের নিকট আসিয়াছিলেন। মধুরাওয়ের তৎকালীন শারীরিক অবস্থায় কোনরূপ উত্তেজনা যে অনিষ্টকর তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন, নতুবা তিনি সন্ধির বিষয় উত্থাপিত করিতেন না। যখন তাহা স্মরণ হইল তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া কক্ষত্যাগ করিলেন। মধুরাওয়ের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক অনেকক্ষণ চিন্তাভারে নিস্তেজ হইয়া রহিল, তাহার পর সমস্ত চিন্তা, সমস্ত উদ্বেগ, অনুশোচনা লুপ্ত করিয়া নিদ্রার আবির্ভাব হইল।

ক্রমে মধুরাওয়ের শারীরিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল, কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য আর ফিরিল না। বিদেশ হইতে প্রত্যাগত প্রবাসী যেরূপ আপনার পরিচিত নির্জ্জন ভবনের ধূলিধূসর কক্ষে উদাসপ্রাণে ভ্রমণ করে, সেইরূপ পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরিত হইয়া মধুরাওয়ের চিত্তের প্রত্যেক অংশ হাহাকারে পূর্ণ করিতেছিল। সে-দুঃখে সান্ত্বনা ছিল না, আর সান্ত্বনার দ্বারা তাহা দূরীভূত হইবার নহে। তাহার উপর বিজয়নগরের ভাগ্যে কি ঘটিতেছে, সে-বিষয়ে তিনি কোন সংবাদ পান নাই। এই পর্য্যন্ত জানিয়াছিলেন যে অবরোধ-কার্য্য চলিতেছে, বিজয়নগরের তখনও পতন হয় নাই। এই অনিশ্চয়তা তাঁহাকে আরও অশান্ত করিতে-ছিল।

মধুরাও দণ্ডায়মান হইয়া ভিত্তিগাত্রে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় সুলতান ও সুলতান-ভ্রাতা তথায় আগমন করিলেন। কয়েকটি নিষ্প্রয়োজন কথার অবতারণা করিয়া ফিরোজ সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যাইবার উল্লেখ করিলেন। মধুরাও আপন চিত্তের সহিত সংগ্রামে বড়ই শ্রান্ত হইয়াছিলেন; তিনি স্বীকৃত হইলেন। হর্ষের আতিশয্যে ফিরোজ ভ্রাতার মুখভাব লক্ষ্য করিলেন না। আহ্‌মদের বদন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধকারময় হইয়াছিল।

পরে মধুরাওয়ের তরবারির প্রতি হস্ত-প্রসারণ করিয়া ফিরোজ বলিলেন, "আপনার বীরপুত্রের অস্ত্র ঐ রহিয়াছে। প্রস্থানের পূর্ব্বে পুত্রের স্মৃতিচিহ্নগুলি লইবেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আপনার খড়্গ ভগ্ন হইয়াছে। আপনি—"

মধুরাও মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "তরবারির প্রয়োজন আমার আর হইবে না। খান্‌খানান্ আমার দক্ষিণ হস্তের শক্তি কাড়িয়া লইয়াছেন।"

গভীর সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে ফিরোজ কহিলেন, "দানায়েক! আমারও দক্ষিণ হস্তে শক্তি নাই। একদিন এই হস্তে আলাউদ্দীন হুসেন শাহের খড়্গ অনায়াসে তুলিয়াছি। আজ আর সে বল নাই। ছয় বৎসর পূর্ব্বে দোয়াবে যখন যুদ্ধ হয়, তখন একটি গ্রাম হইতে একটি তীর আসিয়া বর্ম্ম ভেদ করিয়া আমার হস্ত বিদ্ধ করিয়াছিল।" বলিতে বলিতে সুলতান শিথিল অঙ্গাবরণ উন্মোচন করিয়া আঘাত-চিহ্ন দেখাইলেন। মধুরাও বলিলেন, "সুলতান! খান্‌খানান্ তাহার প্রতিশোধ লইয়াছেন, সে তীর আমিই নিঃক্ষেপ করিয়াছিলাম।" ফিরোজ শাহ্ আগ্রহপূর্ণ-স্বরে কহিলেন, "আমার তাহাতে খেদ নাই, দানায়েক! যুদ্ধে এরূপ হইয়াই থাকে। খোদা জানেন, আমি সে আঘাতের প্রতিশোধ চাহি নাই।" মধুরাও সসম্মানে শির অবনত করিয়া কহিলেন, "সুলতান মহানুভব।"

মধুরাও বিদায়গ্রহণ করিলে ফিরোজ ভ্রাতাকে বলিলেন, "আহম্মদ! বিজয়নগরের রাজপুত্রীর সহিত তোমার বিবাহ হইবে ঠিক করিয়াছি।" আহ্‌মদ্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি এখনও সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই? আমি এখন বিবাহিত—আমার পুত্র হইয়াছে।" আহ্‌মদ্ অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। ফিরোজের বিশাল আন্দাকুন-মহলের জন্য দূর দেশদেশান্তর হইতে রমণীবৃন্দ আহৃত হইত। বসন্ত-সমাগমে বনবিহঙ্গমের কাকলী যেমন কাননের প্রতিকুঞ্জ মুখর করিয়া তুলে, সেইরূপ রূপসীর কলহাস্যে, অলঙ্কারের মধুর গুঞ্জনে ও সঙ্গীতের অশ্রান্ত ঝঙ্কারে তাঁহার প্রমোদ-অন্তঃপুরের প্রতিকক্ষ নিয়ত প্রতিধ্বনিত থাকিত। আহ্‌মদ্ রূপের উপাসক ছিলেন না। সমরের মাদকতা তাঁহাকে এরূপ অভিভূত করিয়া রাখিত যে ভোগ-তৃপ্তির অবসর তাঁহার ছিল না।

ফিরোজ বলিলেন, "এই সঙ্কল্প আমার শেষ জীবনের ধ্রুবতারা। আমার সকল সাধ, সকল আশা-ভরসা এই সঙ্কল্পের সহিত জড়িত। হাসান সম্মত হইল না। সে স্পষ্টই আমাকে বলিয়াছে যে সে বাহমনী-সিংহাসন চাহে না। সেইজন্য তুমি আমার উত্তরাধিকারী। তুমি বিবাহ করিয়াছ, কিন্তু আর একটি বিবাহ করিলে দোষ হইবে না।" আহ্‌মদ্ বলিলেন, "বিবাহ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু এ বিবাহের উদ্দেশ্য কি?" ফিরোজ বলিলেন, "দুই জাতির মধ্যে মিলন চিরস্থায়ী হইবে। আহ্‌মদ্! ভাই! হিন্দুর উপর অত্যাচার করিও না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আপনার উন্নতির জন্য এক ব্রাহ্মণের নিকট ঋণী ছিলেন। আইন্-উল্‌মুল্ক হুসিয়ার খাঁও সেই কথাই বলিতেছিলেন।" আহ্‌মদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; তিনি উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "সে জনপ্রবাদ মিথ্যা। আমরা পারস্য-রাজ বাহমানের বংশধর।" ফিরোজ ঈষৎ ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "রসনা সংযত কর, খান্‌খানান্! ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বাহমনের বংশধরের পক্ষে ব্রাহ্মণের ভৃত্য হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। আমি তোমার জ্যেষ্ঠ, আমি ইহার সম্বন্ধে বেশী জানি।" ভ্রাতার প্রতি

রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া আহ্‌মদ্ বাস্তবিকই দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। তিনি অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন, "শাহেন্‌শাহ্! ভ্রাতার অপরাধ মার্জ্জনা করুন্!" ফিরোজ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "আহ্‌মদ্! তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। আপনার হস্তের অতর্কিত আঘাতে কেহ কি তাহার উপর রুষ্ট হয়? তুমি এই বিবাহের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিতেছ। শুন, হিন্দু-রাজকন্যার সহিত বিবাহের প্রয়োজন হইয়াছে। হিন্দুস্থানের পাঠান কিছুদিন পরে আমাদের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে পারে। দক্ষিণের হিন্দু-মুসলমানে একতা থাকিলে তাহারা ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে।"

আহ্‌মদের হৃদয়-যন্ত্রের অন্তর্নিহিত যুদ্ধ-রাগিণী দ্রুততালে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি সদর্পে বলিলেন, "হিন্দুর সাহায্য না লইয়াই তাহাদিগকে উড়াইয়া দিব। আল্লাহ্ যদি দিন দেন তবে দাক্ষিণাত্যের আলাউদ্দীন খিলিজির ন্যায় হিন্দুস্থান-দাক্ষিণাত্য এক-ছত্রাধীন করিব। এবার হিন্দুস্থান দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিবে না—অদূরে ভবিষ্যতে বাহমনী-সুলতান্ দিল্লীর সিংহাসনে বসিবে। যদি আমার জীবনে এ কল্পনা সফল না হয়, আমার পুত্র তাহা সিদ্ধ করিবে। সেইজন্য তাহার নাম আলাউদ্দীন রাখিয়াছি।"

ফিরোজ নিস্তব্ধ হইয়া ভ্রাতার তেজোগর্ভ উচ্চাশাদীপ্ত বাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন; সহসা আহমদের করযুগ ধারণ করিয়া বলিলেন, "ভাই! শপথ কর।" বিস্মিত হইয়া আহ্‌মদ্ বলিলেন, "কি শপথ, শাহেন শাহ্?" ফিরোজ বলিলেন, "শপথ কর, হাসানের কোন অনিষ্ট করিবে না।" আহমদ্ স্তম্ভিত হইলেন। ফিরোজ ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "ভাই!" আহ্‌মদ্ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিলেন, "সিংহাসন হাসান্ পাউক্।" ফিরোজ বলিলেন, "সে ত' লইবে না—সে কতবার বলিয়াছে সে রাজপদের উপযুক্ত নহে।" আহম্মদ্ শপথ করিয়া কহিলেন, "আমার জীবন থাকিতে হাসানের কেশাগ্র কেহ স্পর্শ করিবে না। সে আমার পুত্র-স্থানীয়! যে তাহার অনিষ্ট করিবে, তাহার জীবন ও নাম অভিশপ্ত হউক।"

বিজয়নগরের রাজপথ অতিবাহিত করিবার সময় যদি মধুরাও নয়ন উত্তোলন করিয়া উভয়-পার্শ্বস্থ হতশ্রী বিপণি ও আবাস-গৃহের অবস্থা দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি শিহরিয়া উঠিতেন; ভাবিতেন নগরীর উপর দিয়া উন্মত্ত ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। দ্বাররক্ষী ও নগরবাসি-গণের সসম্মান অভিবাদনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তিনি আনতনেত্রে পথ অতিবাহিত করিতেছিলেন। তিনি মুক্ত, তথাপি ললাটে বিষাদের রেখা। এ কি তুঙ্গভদ্রের স্মৃতি না বিজয়নগরের পরাজয়! মুসলমান-শিবির ত্যাগ করিয়া নগর-প্রবেশকালে তিনি আহ্‌মদের সৈন্যসজ্জা দেখিয়া নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে সন্ধি না করিলে রক্ষা নাই। ব্যাঘ্র যেমন নিশ্চেষ্ট রহিয়া আহত পশুর মৃত্যু-যাতনা অবলোকন করে, মুসলমান সৈন্য নগরের উপর সেইরূপ লোলুপ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছিল—কেবল ফিরোজের আদেশের অপেক্ষা। বড় দর্প করিয়া মধুরাও যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে-দর্প চূর্ণ হইয়াছে। শত্রুর দয়ায় আপন জীবন রক্ষা পাইয়াছে, বিজয়নগরের মস্তক অবনত হইয়াছে—ইহার মূলীভূত কারণ তিনি।

সভাগৃহে সকলে উৎকণ্ঠিতচিত্তে দূতের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, পত্রবাহক দূত-রূপে যখন মধুরাও উপনীত হইলেন, তখন উৎকণ্ঠা বিস্ময়ে পরিণত হইল। যখন সকলে পত্রের মর্ম্ম অবগত হইলেন, তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিস্ময় ক্রোধে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই মারাপ্পা সহসা সভা-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তিনি মধুরাওয়ের আকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া চমকিত হইলেন। সেই সবল উন্নত দেহ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার স্থলে এই কুব্জ, জরাগ্রস্ত, শীর্ণ স্থবির! মনোভাব দমন করিয়া মারাপ্পা বলিলেন, "মধুরাও! সন্ধির প্রস্তাব আনিয়াছ?" মধুরাও নীরব রহিলেন দেখিয়া দেবরায় বলিলেন, "বাহমনী-সুলতান আমাদিগের বন্ধু হইতে ইচ্ছুক এবং বন্ধুত্বের মূল্য-স্বরূপ তাঁহার ভ্রাতার জন্য বিজয়নগরের এক রাজপুত্রী চাহেন।"

মধুরাও সন্ধির সর্ত্ত শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন; কারণ, ফিরোজ ইহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহাকে কিছুই বলেন নাই। মারাপ্পা বা মধুরাও কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দেবরায় প্রাচীন সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পরাভব, রাজ্যলোপ, সবই সহ্য হয়; কিন্তু মনের অধঃপতন অপেক্ষা অসহনীয় ক্ষতি মানবের ভাগ্যে ঘটে না। আপনি বুক্কের বংশের পরমহিতৈষী হইয়া, সাম্রাজ্যের দণ্ডাধিপতি হইয়া এরূপ প্রস্তাব আনিবেন, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর!" মধুরাও বিকৃতস্বরে বলিলেন, "মধুরাও এখন দণ্ডনায়ক নহে, বাহমনী-সুলতানের অনুগ্রহে মুক্ত বন্দিমাত্র।"

আদোনীর সামন্ত আপনার দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হইয়াছিলেন। প্রাচীন সামন্ত কেহই ছিলেন না। তাঁহাদের যুবক পুত্রগণ যাঁহারা সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "আমরা সন্ধি চাহি না, আমরা যুদ্ধ করিব। বিজয়নগরের প্রস্তর-প্রাচীর এখনও অজেয়।" মারাপ্পা মধুরাওয়ের নিকট গিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "দণ্ডনায়ক মধুরাও! বিবাহের প্রস্তাব আনিয়াছ?" মধুরাও নির্ব্বাক-দৃষ্টিতে মারাপ্পার প্রতি একবার চাহিলেন। মারাপ্পা পুনরায় বলিলেন, "দণ্ডনায়ক মধুরাও! যুদ্ধ কি আর চলিতে পারে?" মধুরাও তথাপি নির্ব্বাক্। সভা নিস্তব্ধ। একজন নবীন সামন্ত সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। যুবকের পিতা সম্প্রতি একটি খণ্ডযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। যুবক বিলাস-শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, তিনি সামন্ত-পদে উন্নীত হইয়াছেন। সভায় যুবক-সামন্ত বলিলেন, "একজন দাসী-পুত্রকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক; কেহ জানিতে পারিবে না—যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইবে।"

এতক্ষণে মধুরাও কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "কোনও প্রয়োজন নাই, যুবক!—মহারাজাধিরাজ! আমার একটি নিবেদন আছে। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ আনিগুণ্ডীর অধিপতি ছিলেন। আমি সাম্রাজ্যের সৈনিক কর্ম্মচারী হইলেও আমার দেহে আনিগুণ্ডী-রাজগণের শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। সম্রাট্—আমার কন্যাকে ফিরোজ-শাহের নিকট পাঠাইয়া দিন্।"

দেবরায় কথা কহিবার পূর্ব্বেই মারাপ্পা বলিলেন, "অসম্ভব, মধুরাও! তোমার শরীরে বিজয়নগরের রাজরক্ত নাই। সুলতানজাদার

স্ত্রী হইবার জন্ত আমার কন্তা দুর্গা যাইবে। বিচলিত হইও না, দেব! যুদ্ধ আর চলিতে পারে না। আমরাও যুদ্ধ-সম্বন্ধে কিছু বুঝি। সাম্রাজ্যের উত্তরাংশ শ্মশান হইয়াছে, কোষে অর্থ নাই। এখন যুদ্ধ করিলে রাজধানীর ধ্বংস হইবে।" দেবরায় বলিলেন, "এ রাজধানী ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাঞ্চলে নূতন রাজধানী স্থাপিত করিব। সাম্রাজ্যের দক্ষিণার্দ্ধে নব রাজ্য গঠন করিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ চালাইব।" মারাপ্পা বলিলেন, "আর বিজয়নগরের দেবমূর্ত্তি, দেবমন্দির, এতগুলি অসহায় নর-নারীর কি অবস্থা হইবে?" দেবরায় বলিলেন, "মথুরা, সোমনাথপত্তনের যে অবস্থা হইয়াছিল, বিজয়নগরেরও সেই অবস্থা হইবে।" ক্রুদ্ধস্বরে মারাপ্পা বলিলেন, "দেবদ্বিজের প্রতি যাহারা ভক্তিহীন, তাহাদেরই মুখে এইরূপ বাক্য শোভা পায়। সে-ভক্তি যদি থাকিত, তাহা হইলে কি বেদ-ভাষ্যকার সায়ণ, বিদ্যারণ্য মাধবের বংশধর লোকাচার্য্যদেব রাজধানী হইতে তস্করের ন্যায় নির্ব্বাসিত হ'ন? আজ যে দণ্ড বিজয়নগরের উপর আপতিত হইয়াছে, তাহা বিধাতার বজ্রদণ্ড, পূর্ব্বাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত।"

অন্য সময় হইলে এরূপ তিরস্কারে দেবরায় স্তম্ভিত হইতেন। কিন্তু এক্ষণে ফল বিপরীত হইল। যে রক্ত, যে তেজ মারাপ্পার শুষ্ক বক্ষে অবস্থান করিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে উগ্র ভৈরবের ন্যায় ভীষণ করিয়াছিল, সেই তেজোরক্তই আজ তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক অংশে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ লোকাচার্য্য বিজয়নগরের সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্তি পাইয়াছেন।" মারাপ্পা পূর্ব্ববৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "ব্রাহ্মণকে শাস্তিদানের অধিকার কাহার আছে?" সহসা মারাপ্পার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, তিনি বলিলেন, "আজ সম্রাট্ পিতৃব্য সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। তোমার পিতৃব্যকে শাস্তি দাও, সম্রাট্! আজ তুমিই আমার পুত্র, দেব! আমাকে শাস্তি দাও। সিংহাসন ত্যাগ করিও না, দেব!" দেবরায় তখনি পিতৃব্যের পাদমূলে আসিয়া নিপতিত হইয়া বলিলেন, "তাত! ক্ষমা করুন। নিষ্ঠুর হইবেন না। বিজয়নগর রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিব।" ভ্রাতুষ্পুত্রকে ধীরে ধীরে উঠাইয়া মারাপ্পা কহিলেন, "তথাপি বিজয়নগর রক্ষা পাইবে না। দেব! যদি জানিতাম কাহারও প্রাণ-বিনিময়ে রাজধানী বিপন্মুক্ত হইবে, তাহা হইলে আমি তাহাতে কুণ্ঠিত হইতাম না। উত্তরাপথের হিন্দু রাজ্যগুলি ধ্বংস হইয়াছে; দেবালয় চূর্ণ হইয়াছে। উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দির আর নাই, তথাকার সে বৃহৎ পুস্তকাগার ধ্বংস পাইয়াছে। হিন্দুর প্রাণের প্রাণ বেদাদি ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি বিজয়নগরের আশ্রয়ে আসিয়া রক্ষা পাইয়াছে। কাল তাহারা যদি এ আশ্রয়-চ্যুত হয়, যদি বিজয়নগরের দেবালয়গুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব লুপ্ত হইবে। এ-সব কথা কি ভাবিয়াছ, দেব? আমার পরামর্শ গ্রহণ করিলে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।"

দেবরায় বলিলেন, "দুর্গা কি আমার কেহ নহে!" মারাপ্পা কঠিনস্বরে বলিলেন, "না— সে আমার কন্যা। যদি এ-বিবাহ অপমান বলিয়া জ্ঞান কর, পরে প্রতিশোধ লইও।" দেবরায় হতাশভাবে বলিলেন, "কাহার উপর

তখন প্রতিশোধ লইব?" মারাপ্পা বলিলেন, "রাজার ভ্রাতা-ভগিনী নাই। রাজার এক-মাত্র কর্ত্তব্য দেশের প্রতি। রাজার কর্ত্তব্য দেশ-রক্ষা, প্রজা-রক্ষা, ধর্ম্ম-রক্ষা।" দেবরায় বলিলেন, "আমার জন্য অন্য শাস্তি বিধান করুন্।" মারাপ্পা বলিলেন, "শাস্তিদানের অধিকার আমার নাই। দেব। অন্য উপায় থাকিলে, আমি তাহা নির্দ্দেশ করিতাম। সিংহাসনে উপবেশন কর। আমার কন্যাকে মুসলমান-হস্তে সমর্পণ করিলে তোমার অপ-মান হইবে না। আমি সন্ন্যাসী—রাজবংশের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আর দুর্গার ভ্রাতার জন্য এ দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার কিছু প্রায়শ্চিত্ত হওয়ার প্রয়োজন।" দেবরায় পুনরায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়-মান হইলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, বৃদ্ধকে কি প্রকারে নিবৃত্ত করা যায়। মারাপ্পা বলিলেন, "দেব! তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। কিন্তু সব কথা তুমিও জান না। সভাস্থ সকলকে শুনাইয়া আজ একটি কাহিনী বলিব।—"

মারাপ্পা উত্তেজনা-বশে মধুরাওয়ের পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া বহুপূর্ব্বে সরিয়া আসিয়াছিলেন। সামন্তবর্গও আপন আপন স্থান ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থলে দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সহসা মারাপ্পার দৃষ্টি মধুরাও যে স্থানে ছিলেন, তথায় পতিত হইল; তিনি দেখিলেন মধুরাও নিশ্চল হইয়া সভা-গৃহতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিনায়ক রাও শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহার চেতনা-সম্পাদনের চেষ্টা পাইতে-ছিলেন। মারাপ্পার বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি ত্বরিতপদে মধুরাওয়ের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার বদনে কমণ্ডলু হইতে বারি লইয়া নিঃক্ষেপ করিতে ব্যাপৃত হইলেন।

চেতনা পাইয়া মধুরাও বলিলেন, "মারাপ্পা! দুর্গাকে বিসর্জ্জন দিলে?" পার্শ্ব হইতে বিনায়করাও বলিলেন, "সভায় শেষে তাহাই স্থির হইয়াছে।" মধুরাও ক্ষণকাল-পরে বলিলেন, "ত্র্যম্বকের পুত্র! মারাপ্পা কোথায়?" বিনায়করাও বলিলেন, "আপনার চেতনা ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি প্রস্থান করিয়াছেন।" মধুরাও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

উপদেশের ঝুড়ি।

শীতকাল আসিয়াছে। ছেলেপিলের গায়ে গরম কাপড়-চোপড় দেওয়ার দরকার। কিন্তু যাহাতে ছোট ছোট ছেলেপিলে গরম কাপড়-চোপড় পরিয়া প্রদীপের কাছে না যায়, সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হারিকেন্ লণ্ঠন জ্বালা থাকিলে কাপড়-চোপড়ে আগুন লাগার ভয় থাকে না, আর ঘরে তত কালো ঝুল হয় না। কেরোসিনের ল্যাম্প (যা'কে অনেক জায়গায় কুপী বলে) ঘরে রাখিলে ঝুল হয়, আর তার নিকট দিয়া যাওয়া-আসা করিলে কাপড়ে আগুন লাগিয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে গৃহস্থ-ঘরে রেড়ীর তৈলের প্রদীপের বেশী প্রচলন। পিলসুজগুলিকে একটু উঁচু ও নিরাপদ্ জায়গায় রাখিয়া দিলে কোন বিপদের সম্ভাবনা আর থাকে না।

দিয়াশলাই আর শস্তা নাই। তবুও এক আধ পয়সা কমে যে শস্তা দিয়াশলাই পাওয়া যায়, তাহা ব্যবহারের সময় একটি কাটি বা

শলা জ্বালাইলে, অনেক সময় সমস্ত বাক্সটা জ্বলিয়া উঠে। কখনও কখনও পরস্পরের সহিত ঘর্ষণে কাঠিগুলি বাক্সের মধ্যে আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠে। দেখিয়া শুনিয়া ভাল সেফটি (Safety) ম্যাচ বক্স বা দিয়াশলাইয়ের বাক্স কিনিলে ভাল হয়।

কাপড়-চোপড়ে আগুন ধরিয়া গেলে ভয়ে ছুটাছুটি করিলে আগুন বেশী করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ছোট ছোট ছেলেপিলের উপস্থিত-বুদ্ধি কমই থাকে। তাহারা এরূপক্ষেত্রে ভয়ে ছুটিয়া বেড়ায়। এ-সময় উচিত, শরীরের চারিধার মোটা কম্বলে ঢাকিয়া মেঝের উপর গড়াগড়ি দেওয়া। এরূপ করিলে আগুন নিবিয়া যায়। জ্বলন্ত কাপড়চোপড় শুদ্ধ মানুষের উপর কখনও জল ঢালিয়া দিতে নাই! আগুন নিবাইবার জন্য জল ঢালিয়া দিলে অনেক সময় প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে। শরীরের দু'এক জায়গা সামান্যরূপ পুড়িয়া গেলে আলু ছেঁচিয়া(?) বা নারিকেল তেল এবং চূণের জল ভাল করিয়া মিশাইয়া তাহার প্রলেপ প্রভৃতি দেশী টোট্‌কা ঔষধ লাগান যাইতে পারে। বেশী রকম পুড়িয়া গেলে ডাক্তার ডাকাই উচিত।

আমাদের দেশে শীতকালে ঘরের দুয়ার-জানালা, ফাটাফুটা সমস্ত রীতিমত বন্ধ করিয়া ঘুমান রীতি। কিন্তু ইহাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এক ঘরে অনেকজন থাকিলে অনেকখানি বাতাসের দরকার। ঘরের সব দুয়ার, জানালা প্রভৃতি বন্ধ থাকিলে, নূতন বাতাস ঘরের ভিতর ঢুকিবার পথ পায় না, আর যে বাতাস ভিতরে থাকে, তাহা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধময় হয়, বৈরুবার পথপর্য্যন্ত পায় না। রাত্রিতে শোবার সময় ঘরে একটু বাতাস ঢুকিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিলে ভাল হয়। লখীন্দরের বাসরঘরের মত আটঘাট-আঁটা ফুটাফাটা-বুজান ঘরে শোয়া ভাল নয়।

ঘর যাহাতে গরম থাকে সেজন্য অনেকে ঘরের মধ্যে কয়লা জ্বালিয়া শুইয়া থাকেন। এতে সাঙ্ঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা। সেদিনও শুনিলাম পাথুরের কয়লায় আগুন দিয়া কয়েক জন লোক ঘরের দুয়ার-জানালা আঁটিয়া শুইয়াছিল,—আর রাতের মধ্যেই তাহাদের সকলেই দমবন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখার দরকার। 'ওম্' করিবার জন্য অনেকে নাক-মুখ লেপের মধ্যে ঢাকিয়া শুইতে ভালবাসেন। স্বাস্থ্যের পক্ষে এ অভ্যাসটি বড় খারাপ। বাতাস মানুষের প্রাণ। ইচ্ছা করিয়া খারাপ বাতাস শরীরে ঢুকাইলে মরণকে ডাকিয়া আনা হয়। মানুষের প্রাণ বড় কঠিন, শীঘ্র বাহির হয় না। শরীর এত নিরীহ ভালমানুষ যে, শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে। তা'র পর একদিন এমন বাঁকিয়া বসে যে, তাহাকে ভালর দিকে আনিবার জন্য 'হোমরা চোমরা ডাক্তারও হিম্‌সিম্ খাইয়া যান।

আমাদের একটা ধারণা আছে, গরম পশমী কাপড় বড় শুদ্ধ; সেটা যতই অপরিষ্কার তেলচিটে হউক্ না কেন, কিছুতেই অশুদ্ধ হবে না। আমাদের ধারণা অনুসারে না হয় অশুদ্ধ না হ'ল, কিন্তু সেটা অস্বাস্থ্যকর হয়। যদি এ-কথা শুনেও তেলচিটা ময়লা পশমী জামা আলোয়ান পরিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি না জন্মায় তবে শেষ কথা এই, এরূপ ময়লা জামা আলোয়ান বেশী দিন টিকিবে না। তেলে জলে বাঙ্গালীর ছেলে মানুষ হয়, এটা সত্য কথা।

আর এটিও সত্য যে কাপড়-জামা বেশী তেল-চিটা হইলে বাঙ্গালীর ছেলে বেশীদিন ধরিয়া সেগুলি পরার সুখ ভোগ করিতে পারিবে না। পরার সুখ বেশী দিন ভোগ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, সেগুলিকে জলের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করাইতে হইবে,জামার গায়ের ময়লামাটিও ধুইয়া দিতে হইবে। জামা-কাপড়ের যে-রকম দাম বাড়িয়াছে, তাহাতে নষ্ট হইবে, এ-কথায় হৃৎকম্প হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা স্বাস্থ্যের মায়া করেন না, তাঁহারা পয়সার মায়া করিবেন, এ ভরসা আমরা রাখি; কারণ, অনেকেই স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াও পয়সা-রোজগার করিতে ব্যস্ত।

গরম কাপড়ের জামা পরিলেই যে শীত নিবারণ হইবে, আর কিছুতে হইবে না, এমন, কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই। সূতার কাপড়ের তৈয়ারী জামা কয়েকটি একসঙ্গে একটির উপর আর একটি করিয়া পরিলেও অনেক সময় শরীর গরম থাকে; কারণ, জামাগুলির ফাঁকে ফাঁকে যে বাতাস থাকে, সেইটা গরম হইয়া শরীরকে রক্ষা করে। অবশ্য তাই বলিয়া এ-কথা যেন কেহ না ভাবেন যে, তিন-চার-তালা সূতার কাপড়ের জামা পরিয়া শীতকালের দার্জ্জীলিঙ্গের দুর্জ্জয় শীতের সঙ্গে একবার তাল ঠুকিয়া লড়াই করিয়া আসিতে পারা যাইতে পারে।

ষ্টকিং বা এষ্টাকিনের বা মোজার সম্বন্ধে একটি বক্তব্য আছে। ষ্টকিং ব্যবহার করিয়া মাঝে মাঝে সাবান দিয়া কাচিয়া দিতে হয়। পায়ের ঘাম ও জুতার মধ্যে যে রাস্তার ধুলা জমে, এই দুইয়ে মিশিয়া ষ্টকিংকে শক্ত চটের মত করিয়া দেয়; তাহাতে ষ্টকিং কাটিয়া যায়। অনবরত ব্যবহারে ষ্টকিং-এ দুর্গন্ধও হয়। মাঝে মাঝে কাচিয়া দিলে দুর্গন্ধ ও কাটিয়া যাওয়া, এই দুই প্রকার ভয় হইতেই নিস্তার পাওয়া যায়। যাঁহারা নেহাৎ এক-রোখা ও যাঁহাদের জুতা বড়, তাঁহারা অবশ্য গ্রিজারভার বা নেকড়ার জুতা ব্যবহার করিবেন।

শ্রীশ্রীরামশর্ম্মা

সঙ্কলন।

কলহ-প্রিয় শিশু—আমাদের পরিবারে শিশুদিগের মধ্যে কলহ প্রকৃতিগত। তাহারা সকল ভাই ভগ্নী যেমন পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকিতে ভালবাসে না, সেইরূপ তাহারা আবার একত্র হইলেই কলহ ও মারামারি। অনেক সময় দেখা যায়, বালক-বালিকাদের মধ্যে এক একজন অত্যন্ত কলহ-প্রিয় হয়। তাহারা যে-কোন শিশু-মণ্ডলীর মধ্যেই থাকুক, সেখানেই কলহের সৃষ্টি করিয়া মহা অশান্তি করিয়া তুলে। এই সকল শিশুরা অধিকাংশই একগুয়ে ও সকলকে তাহার ইচ্ছানুবর্ত্তী করিতে উৎসুক। তাহারা অন্যান্য শিশুদের নেতৃপদ নিজেরাই গ্রহণ করে ও তাহাদের প্রতাপ অমান্য করা অসম্ভব। কিন্তু এই কলহপ্রিয় শিশুরা নিজেরাও নষ্ট-প্রকৃতি এবং অন্যান্য শিশুদিগের প্রকৃতিও নষ্ট করে। শিশুরা যত শীঘ্র কলহ করিতে শিখে, তত শীঘ্র কলহ না করিতে শিখে না, এবং

পিতামাতা দিগের এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সবিশেষ প্রয়োজন। কারণ, শিশুসন্তানদিগের ভবিষ্যৎ মানসিক প্রকৃতি ইহার উপরই নির্ভর করে ও তাহাদের প্রকৃতির জন্য মাতাপিতাই দায়ী।

শিশুদিগের মধ্যে এই কলহ-নিবারণের সহজ উপায়,—কোন কলহপ্রিয় শিশু কলহের সূচনা করিতেই তাহাকে অন্যান্য শিশুদিগের নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া দেওয়া ও তাহাদিগের ক্রীড়াতে যোগ দিতে না দেওয়া। ইহা প্রথমে নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু শিশুদিগের চরিত্র-গঠন-হিসাবে ইহা নিষ্ঠুরতা নহে। শিশুরা একাকী থাকা সহ্য করিতে পারে না, ইহা মানবজাতিরই প্রকৃতি। সুতরাং কলহপ্রিয় সহজে ধীর হইয়া আসে। বলিষ্ঠ শিশু দুর্ব্বল শিশুদের উপর অত্যাচার করিতেছে, দেখিলে মাতাপিতাদিগের তাহা নিবারণ করা আবশ্যক। শিশুদিগকে নিরপেক্ষতা ও ন্যায্য-ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া প্রধান কার্য্য। এই জ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইলে তাহারা সহজেই সকলের সঙ্গে মিশিতে পারিবে। মাতাপিতা তাঁহাদিগের সন্তানের মধ্যে কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিলে, সে অন্যান্য ভাইভগ্নীদের উপর প্রভুত্ব দেখাইতে উন্মুখ হয় এবং তাহারা তাহাকে অমান্য করিলে, কলহের সৃষ্টি করে। এ-বিষয়ে মাতাপিতার সাবধনতা আবশ্যক।

বিচক্ষণ মাতারা, যাহাতে তাঁহাদের সন্তানগণ মিলিয়া মিশিয়া থাকে, তাহার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিবেন। তাঁহাদের যদি কোন কলহপ্রিয় সন্তান থাকে, তাহার প্রতি তাহাদের অধিকতর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ছোট বড় সকল সন্তানেরা যদি সদ্ভাবে পরস্পরের সহিত শান্তিতে ক্রীড়া করিতে পারে, তাহা হইলে কেবল যে মাতা ও পরিবারের শান্তি, তাহা নয়, ইহা শিশুদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের শান্তিপ্রিয়তার ভিত্তি। মাতার দৃষ্টি সর্ব্বদাই শিশুদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। এ-বিষয়ে তাঁহাদের অবহেলা বিপজ্জনক। শিশুদিগের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভালবাসার পরিচায়ক।

বৃক্ষের রাজা।—বিলাতে ওক্ (oak) বৃক্ষকে বৃক্ষের রাজা (king of trees) বলে। যাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন "oak with misletoe growicg on it" ওক বৃক্ষের উপর পরগাছাকে, পুরাকালে ইংলণ্ডের আদিমনিবাসিগণ দেবতা বলিয়া পূজা করিত। এই ওক্-বৃক্ষের কাষ্ঠ সকল কাষ্ঠের অপেক্ষা দৃঢ় ও দীর্ঘকালস্থায়ী। একটি ওক্-বৃক্ষের আয়ু ৭০০ বৎসরের অধিক। বৃহদাকার জাহাজের মাস্তুল প্রভৃতি এই ওক্-কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়। ইহা ঝড়, জল, রৌদ্র সমানভাবে সহ্য করিতে পারে; সেই জন্য ইহাকে বৃক্ষের রাজা বলে।

ঐ সকল দেশে ওক্ বৃক্ষ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। ইহা খুব দীর্ঘ হয় না, কিন্তু ইহার প্রস্থ ও পরিধিই সমধিক। ইহার বৃদ্ধি খুবই ধীর। বৃক্ষের প্রথম বৃদ্ধির পর ইহা বৎসরে এক ইঞ্চের অধিক বর্দ্ধিত হয় না। শীতকালে এই বৃক্ষের কাণ্ডের রং গাঢ় হয় এবং ত্বক্ অত্যন্ত অমসৃণ হয়। ইহার বিশাল শাখা ও প্রশাখা-সকল ঐরূপ আকার ধারণ করে এবং এই শাখা-সকলই জাহাজ নির্ম্মাণকারীদিগের বিশেষ আদরণীয়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 714. January, 1923.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৬০ বর্ষ। ৭১৪ সংখ্যা।	মাঘ, ১৩২৯। জানুয়ারী, ১৯২৩।	১২শ কল্প। ৩য় ভাগ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

দশম অধ্যায়

নবম অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "এই জগতের সকলই আমি করিতেছি। আমি সকলেরই মূল কারণ ও সর্ব্বগত, ইহা জানিয়া আমাতেই চিত্ত রাখিবে, তাহা হইলেই পরম গতি পাইবে।" এই দশম অধ্যায়ে এক্ষণে বিভূতিযোগ ব্যাখ্যা করিয়া তাহাতে কিরূপে পারদর্শী হইতে হইবে, তিনি তাহার উপদেশ দিতেছেন। তাই তিনি বলিলেন, "অর্জ্জুন, তুমি আমার অতিপ্রিয়, তোমার মঙ্গলের জন্য আবার আমার স্বরূপ-বিষয়ক পরম জ্ঞানের কথা বলিতেছি, অবহিত হইয়া তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমার প্রভব অর্থাৎ আবির্ভাব দেবতা কিংবা ঋষিগণও অবগত নহেন। কারণ, তাঁহারা আমা হইতেই উৎপন্ন, আমি সর্ব্বতোভাবেই তাঁহাদেরও আদি। আমার আদি অর্থাৎ কারণ আর কেহই নাই। যিনি আমাকে অজ, অনাদি এবং সর্ব্বলোকমহেশ্বর বলিয়া স্বরূপভাবে অবগত হন, তিনিই সকল ভূতের মধ্যে অর্থাৎ এই মনুষ্যলোকে মোহরহিত হইয়া যাবতীয় পাপ হইতে পরিমুক্ত হন; অর্থাৎ তিনি সর্ব্বপ্রকারে দ্বৈতভাব-রহিত হইয়া সদা আমাতে যুক্তাত্মা হইয়া থাকেন; অর্জ্জুন, তুমি যে এই জীবলোকে বুদ্ধি (অর্থাৎ কোন্ বস্তু নিত্য এবং কোন্‌টী অনিত্য ইহার বোধ), জ্ঞান (অর্থাৎ আত্মবিষয়ক জ্ঞান), অসংমোহ (ব্যাকুলতার অভাব), ক্ষমা অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, সত্য, দম (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বক্ এই পাঁচটী বাহ্য ইন্দ্রিয়কে তাহাদের স্ব স্ব বিষয় রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ হইতে

নিবৃত্ত করা), শম (অর্থাৎ রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা বা সংযত করা) সুখ, দুঃখ, ভব (উৎপত্তি), অভাব (নাশ), ভয়, অভয়, অহিংসা (পরপীড়া নিবৃত্তি), সমতা (রাগদ্বেষরহিতঅবস্থা), তুষ্টি, তপ, দান (ন্যায় উপায়ে লব্ধ ধনাদির উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ), যশ, অযশ—এই যে বিবিধ ভাব প্রাণিগণের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে, তাহাও আমা হইতেই জন্মায় জানিও। আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে আর কিছুই নাই। দেখ, ভৃগু প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি, এবং তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি চারিজন মহর্ষি, আর স্বায়ম্ভুবাদি চৌদ্দজন মনু, ইহারা সকলেই আমার প্রভাববিশিষ্ট এবং হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই সঙ্কল্পরূপ হইতেই জাত; জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই সমুদায় ব্রাহ্মণাদি তাঁহাদেরই সন্তানসন্ততি। কিন্তু বাস্তবিক এ-সকলই আমার বিভূতি এবং যোগমাত্র; ইহা যিনি তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা জানিতে পারেন, তিনি অচল-যোগ-দ্বারা অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি-দ্বারা অর্থাৎ ভ্রান্তিশূন্য অবস্থার দ্বারা আমাতেই যুক্ত হইয়া থাকেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

"অর্জ্জুন, আমিই এই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, আমা হইতে সকলই প্রবর্ত্তিত হইতেছে, অর্থাৎ আমিই এই সকলের মহান্ উৎস। বিবেকিগণ অর্থাৎ জ্ঞানী সাধকবর্গ এই বিষয় অবগত হইয়া আমার অনন্তভাব প্রাপ্ত হইয়া আমারই পূজা করেন। তাঁহারা আমাতেই চিত্ত ও প্রাণ অর্পণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আমার স্বরূপ বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন এবং সদাই মদ্বিষয়ক কথা কীর্ত্তন করিয়া পরম শান্তি-সুখ উপভোগ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই, জানিও। কারণ, তাঁহারা যে সতত ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই বুদ্ধিযোগ আমিই তাঁহাদিগকে প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হইতে পারেন। অর্থাৎ আমিই তাঁহাদের কল্যাণার্থ তাঁহাদের বুদ্ধি-বৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান তত্ত্বজ্ঞান-রূপ দীপদ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানজাত অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকি। কারণ, আমি জ্ঞানরূপে সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তাঁহাদের মার্জ্জিতবুদ্ধিতে আমি সত্য-সকল প্রকাশিত করিয়া দিয়া থাকি; তাই আর তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার থাকে না। তাঁহারা সদাই চৈতন্যে স্থিত হইয়া থাকেন।"

অর্জ্জুন ভগবানের এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "হে ভগবন্, আপনি তো পরব্রহ্ম, পরম আশ্রয় এবং পরম পবিত্র; ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত দেবল, ব্যাস আপনাকে নিত্যপুরুষ স্বপ্রকাশ, আদিদেব অর্থাৎ তাঁহাদেরও কারণস্বরূপ, জন্মরহিত ও সর্ব্বব্যাপক কহিয়া থাকেন; তুমি স্বয়ংও আমাকে এইরূপই কহিতেছ। হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা বলিলে, সে সকল আমি সত্য মনে করি। কারণ, দেবগণও তোমার আবির্ভাব অর্থাৎ আবির্ভাবের কারণ জানেন না, এবং দানববর্গও তাহা জানেন না। হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন ভূতসকলের উৎপা-দক, হে ভূতেশ, হে দেবদেব অর্থাৎ দেবগণের প্রকাশক, হে জগৎপতে, তুমি আপনিই আপনাকে আপনার দ্বারা জান।

কারণ, তুমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই।

এক্ষণে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিলেন, "তুমি তোমার যে-সকল বিভূতি-দ্বারা এই লোক-সমুদয় ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সেই সমুদয় আত্ম-বিভূতি অশেষপ্রকারে আমাকে বল। হে যোগিন্, আমি সর্ব্বদা কিরূপে অর্থাৎ তোমার কিরূপ বিভূতি-ভেদ-দ্বারা তোমাকে সর্ব্বদা ভাবনা করিয়া জানিতে পারিব, তাহা আমাকে বল। হে জনার্দ্দন, তোমার যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি আমাকে বিস্তৃতরূপে পুনরায় বল। কারণ, তোমার অমৃতরূপ বাক্য শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অর্থাৎ আরও শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

'বিভূতি'র অর্থ সম্পূর্ণরূপে মায়ার আশ্রয়ে আবির্ভূত হওয়া। ভগবান্ আপন অক্ষর পুরুষ রূপ হইতে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট প্রভৃতি রূপ আবির্ভূত করিয়া কিরূপে সর্ব্বময় হইয়াছেন, তাহা অর্জ্জুন জানিতে চাহিতেছেন। ভগবান্ যে স্বাত্মরূপে সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন, অথচ যোগ-মায়ার দ্বারা আবৃত রহিয়াছেন, অর্জ্জুন সেই আবরণ অপসারিত করিয়া স্বল্পাবলম্বনে সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন। তাই তিনি বলিতেছেন, 'আমি কোন্ বস্তুতে কিরূপে আপনাকে ভাবনা করিয়া জানিব, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলুন।

তখন ভগবান্ বলিলেন, 'অর্জ্জুন, আমার বিভূতির কি অন্ত আছে? আমি নিজে অনন্ত-স্বরূপ, সুতরাং আমার বিভূতিও অনন্ত প্রকার। যাহা হউক্ মোটামুটি, আমার প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি বলিতেছি। তাহা ধরিয়াই তুমি আমার পূজা করিবে, ভাবনা করিবে এবং তাহাই আমাতে পৌঁছিবার উপায়স্বরূপ অবলম্বন করিবে। অর্জ্জুন, আমিই ভূতগণের অভ্যন্তরস্থিত আত্মা আবার আমিই তাহাদিগের জন্ম, স্থিতি এবং সংহারের কারণ। আমা হইতেই সকল হইতেছে জানিবে। আমিই দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিঃ সকলের মধ্যে কিরণশালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। আমি বেদ-সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের চেতনা। আমি একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ-রাক্ষসের মধ্যে কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে অগ্নি, এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু। হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিও। আমি সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়, এবং স্থির জলাশয়-সমূহের মধ্যে সাগর। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু এবং বাক্য-সকলের মধ্যে একাক্ষর অর্থাৎ ওঁকার। যজ্ঞ-সকলের মধ্যে আমি অজপারূপ জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়। আমি বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্ররথ, এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি। অশ্ব এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমাকে অমৃতের নিমিত্ত ক্ষীরোদ-মন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃ-শ্রবাঃ এবং ঐরাবত জানিও। আর মানবগণের মধ্যে আমাকে নরাধিপ বলিয়া জানিও। অস্ত্র-সকলের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু। আমি প্রজাগণের উৎপত্তি হেতু কন্দর্প এবং বিষধর সর্পগণের মধ্যে বাসুকি। আমি বিষশূন্য নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ। পিতৃগণের

মধ্যে আমি পিতৃদিগের রাজা অর্য্যমা এবং সংযমীদিগের মধ্যে যম। আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, বশীকারিগণের অথবা গণনাকারিগণের মধ্যে কাল (গণক বা বশীকর্ত্তা)। মৃগগণের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়। আমি বেগবান্‌দিগের মধ্যে পবন, অস্ত্রধারিগণের মধ্যে রাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর, এবং স্রোতস্বতী মধ্যে জাহ্নবী। হে অর্জ্জুন, আমিই সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত, বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি আত্মবিদ্যা এবং বাদিগণের মধ্যে বাদ-অর্থাৎ পরস্পরকে হারাইবার ইচ্ছা না করিয়া, (কেবলমাত্র তত্ত্বনিরূপণ) জল্প-(অপরের মত খণ্ডন করিয়া নিজের মত স্থাপন করা) এবং বিতণ্ডা (কেবলমাত্র পরের মত খণ্ডনের জন্য বাক্যাড়ম্বর।) নামক যে তিন প্রকার কথা প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে আমি বাদ। অক্ষরগণের মধ্যে অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, আমি প্রবাহরূপ অক্ষয়কাল, এবং বিশ্বতোমুখ ধাতা, অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফল-বিধাতা। আমি সংহারকগণের মধ্যে সর্ব্বসংহারক মৃত্যু এবং ভবিষ্যৎ-প্রাণিগণের উদ্ভব, আর নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্‌, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ও ক্ষমা,—এই সপ্তদেবতা রূপী। আমি সাম সকলের মধ্যে বৃহৎ-সাম, বেদ-সকলের মধ্যে গায়ত্রী, মাস-সকলের মধ্যে মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ এবং ঋতু সকলের মধ্যে বসন্ত। আমি বঞ্চকগণের দ্যূত, তেজস্বীদিগের তেজ, জেতৃদিগের জয়, উদ্যমশালীদিগের উদ্যম, এবং সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব। আমি বৃষ্ণিবংশের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়। আমি মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে উশনা অর্থাৎ শুক্রাচার্য্য। আমি দমনকারিগণের দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের মধ্যে নীতি, গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় সকলের মধ্যে মৌন, এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান। হে অর্জ্জুন, যাহা সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, কারণ তাহা আমিই, যে-হেতু আমি ব্যতীত যাহা বর্ত্তমান থাকে, চর বা অচর এমন ভূতই নাই। অর্থাৎ আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য সকলের অন্ত নাই। এই বিভূতি বাহুল্য আমি সংক্ষেপে কহিলাম। ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত অথবা প্রভাব-বলাদি গুণ-দ্বারা যাহা বর্ত্তমান আছে, তুমি সে সমুদয়ই আমার প্রভাবের অংশ-সম্ভূত বলিয়া জানিও। অথবা হে ধনঞ্জয়! এইরূপ পৃথগ্‌বিধ বহু জ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই সমুদয় জগৎ আমার একাংশে ধরিয়া অবস্থিত আছি; অর্থাৎ আমার এক পাদেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, আমার আর তিন অংশ বা পাদ অনন্ত, সত্য ও শুদ্ধ রূপে সদা মুক্ত।” অবশ্য নিরবয়ব ব্রহ্মের আর অংশ কোথায়? তবে অজ্ঞানিগণের সহজে বোধগম্য হইবার জন্য সবল ব্রহ্ম, অর্থাৎ যেখানে প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থা এবং বলরহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম অর্থাৎ যেখানে প্রকৃতি ব্রহ্মে বিলীন,—এই দুই অবস্থা বর্ণন করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপের উপদেশ দেওয়া হয়। উক্ত প্রথম অবস্থাটিকে লক্ষ্য করিয়া জগৎ একাংশে স্থিত বলা হইল এবং অপর অবস্থাটি সদা শুদ্ধ মুক্ত ও অনন্ত।

এইরূপে ভগবান্‌ অর্জ্জুনকে তাঁহার প্রশ্নানুসারে নিজ বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য্য প্রধান ভাবে বুঝাইলেন। মানুষের শরীর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ-ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যত সৃষ্টি আছে, তাহাদের সকলের সমষ্টিই বৃহৎ

ব্রহ্মাণ্ড। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যাহা আছে, এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাই আছে। যোগীরা দিব্যচক্ষে তাহা দর্শন ও অনুভব করিতে পারেন। ভগবান্ প্রাণরূপে ও জ্ঞানরূপে এবং সত্তারূপে সকলেরই অন্তর বাহ্য পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন—"অর্জ্জুন, —তুমি এই যাহা কিছু দেখিতেছ বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়-দ্বারা যাহা অনুভব বা উপভোগ করিতেছ, সে সকলেই আমার আবির্ভাব বলিয়া বুঝিও এবং তাহারই মধ্যে আমাকে ভাবনা করিতে করিতে ক্রমে আমার নিরবয়ব অরূপ-ভাবে পৌঁছিয়া শান্তি পাইবে। তুমি সহজে ধারণ করিতে পারিবে বলিয়া আমি আমার চারি পাদ বা অংশ কল্পনা করিয়া তোমাকে বুঝিতে বলিতেছি। আমার একাংশেই আমার মায়াশক্তি এই বিচিত্র রচনা প্রকটিত করিয়াছে। আর আমার সত্যরূপ, চৈতন্যরূপ, ও অনন্তরূপ এই তিন পাদ অব্যক্ত। কিন্তু জানিও যে আমা হইতে স্বতন্ত্র কিছুই নাই। কেবল আমার বিভূতি ও ঐশ্বরিক যোগমায়া সকলই বিধৃত রহিয়াছে। এবং ইহা ভাবনা করিয়া আমার পূজা কর। আমাকে পাইয়া শান্তি পাইবে। অর্জ্জুন, তুমি ইহা ধরিয়া সাধন করিয়া যাও, তাহা হইলেই তুমি সমদর্শী হইতে পারিবে, অর্থাৎ আমাকে মাত্রই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে। এবং শেষে আমাময় হইয়া শান্ত হইবে, অর্থাৎ তোমার সকল কার্য্যের শেষ হইবে। কারণ, তখন তুমি কার্য্যব্রহ্ম হইতে শেষ কারণ ব্রহ্মে এবং তাহা হইতেও পরম অব্যক্তে গিয়া পৌঁছিবে। তাহার পর আর কিছুই দ্বৈত নাই যে মোহিত হইবে। সে অনন্ত সচ্চিদানন্দ রূপ। একবার তাহাতে পৌঁছিলে আর ফিরিতে হয় না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দত্ত।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

হরিদ্বার—সাহারাণপুর জেলার অন্তঃপাতী রুড়কী তহশিলস্থ জোয়ালাপুর পরগণায় হরিদ্বার অবস্থিত। এখানকার লোক সংখ্যা ৪৯১৬ জন। হিন্দুর নিকটে হরিদ্বারের সম্মান বেশী। সকল স্থানেই গঙ্গা সুলভ কিন্তু হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গা সাগরের গঙ্গা অতি দুর্ল্লভ। তীর্থ মাহাত্ম্যের আধিক্য হেতু হরিদ্বারের গঙ্গায় ইন্দ্রাদি দেবগণও সমাগত হইয়া স্নান করেন। এখানে দেহত্যাগ করিলে কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে। হরিদ্বার হরিপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ বলিয়া প্রতিবৎসর অনেক তীর্থযাত্রী এখানে সমাগত হয়। তীর্থ-প্রাপ্তির জন্য পার্ব্বন শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। তীর্থে উপনীত হইলেই পার্ব্বন শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

হরিদ্বার নানা নামে খ্যাত। শৈবগণ ইহাকে হরদ্বার ও বৈষ্ণবগণ ইহাকে হরিদ্বার বলিয়া থাকেন। বিষ্ণুপুরাণে স্থানটী হরিদ্বার নামে খ্যাত। গঙ্গা বিষ্ণুপদতল হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন বলিয়াই বৈষ্ণবগণ ইহাকে হরিদ্বার বলিয়া থাকেন। হরিদ্বারে বিষ্ণুর পাদপদ্ম আছে

বলিয়াই বৈষ্ণবগণ স্থানটীকে হরিদ্বার বলেন। শৈবগণ বলেন যে গঙ্গার প্রধান শাখা ভাগিরথী—তাহা মহাদেবের কৈলাস হইতে উৎপন্ন, সুতরাং স্থানটীর নাম হরদ্বার।

মহাভারতে লেখা আছে যে কুরুকুলপ্রদীপ মহাবাহু অর্জ্জুন বনে প্রস্থান করিলে অনেকেই তাঁহার সহিত গমন করেন; তন্মধ্যে বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণ, ভিক্ষোপজীবিসকল, পৌরাণিক সূতগণ, কথকগণ এবং বনবাসী সন্ন্যাসিসকল ছিলেন। পাণ্ডুনন্দন সেই সমস্ত মধুরভাষী মহাত্মাগণ ও অন্যান্য সহায়ে পরিবৃত হইয়া দেবগণসমাবৃত অমররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে রমণীয় বিচিত্র কানন, সরোবর, নদী, সাগর, বিবিধ দেশ ও পুণ্যতীর্থসকল দর্শন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়া তথায় আশ্রম নির্দ্ধারিত করিলেন। তথায় স্নান ও পিতামহগণের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া অগ্নিকার্য্য করিবার নিমিত্ত যেমন জল হইতে উঠিতেছিলেন অমনি নাগরাজ-দুহিতা উলূপী আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবার আশয়ে তাঁহাকে জলমধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইল। অর্জ্জুন পরমার্জ্জিত নাগরাজভবনে সমুপস্থিত হইয়া হুতাশন অবলোকন করিয়া সেই স্থানেই অগ্নিকার্য্য সমাধা করিলেন। এইখানে অর্জ্জুন কিছুদিন উলূপীর সহিত বাস করেন।

হরিদ্বারের পুরাতন নাম কপিলা। এই স্থানে কপিলমুনি তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি যেস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন অদ্যাপিও পাওয়া গিয়া থাকে। ইক্ষাকুবংশে সগর নামে এক ভূপতি ছিলেন। তিনি ষড়ঙ্গিনীসেনা সমভিব্যাহারে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। রথ অশ্ব, কুঞ্জর, পদাতিক ও ঐর্দ্ধাখি যুদ্ধোপকরণ শতঘ্নীতবক এবং কতশত অর্ণবপোত তাঁহার সর্ব্বদা সঙ্গীভূত থাকিত। সগরের দুই মহিষী, জ্যেষ্ঠা কেশিনী, কনিষ্ঠা সুমতি। কেশিনীর গর্ভে "অসমঞ্জ" নামে এক পুত্র জন্মে। সুমতির গর্ভে ষষ্ঠি সহস্র পুত্র হয়। অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান। অসমঞ্জা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, সর্ব্বদা প্রজাদিগের অনিষ্টসাধন করিতেন বলিয়া পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি সর্ব্বদা অরণ্যপ্রদেশে আরণ্যজাতির সহিত ভ্রমণকরিতেন। ইক্ষাকু-কুলপ্রদীপ রাজা সগর বহুদিন রাজ্যপালন করিয়া শেষাবস্থায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে আনয়ন করতঃ মহাসম্ভূত সম্ভারে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হন। একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ এক বৎসরে সমাপ্ত হয়, তাহাতে মহারাজা ক্রমে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করেন। কেবল শেষাশ্বমেধ যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্র স্বপদ-ভ্রংশ্য-শঙ্কায় বিঘ্নাচরণপূর্ব্বক যজ্ঞীয় অশ্বকে অপহরণ করিয়া কপিলাশ্রমে সংস্থাপন করেন। রাজা অশ্বান্বেষণে বলিষ্ঠ পুত্রগণপ্রতি আদেশ করাতে তাহারা সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া অনু-সন্ধান প্রাপ্ত না হওয়াতে, পরে পৃথিবীর চারি-ধারে সমুদ্রতীর খনন করিয়া পাতাল-গমনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সেই পরিখাতের নাম সাগর। তত্তীরস্থ স্তূপীকৃত মৃত্তিকাসকল দ্বীপবৎ হইয়াছিল। অনন্তর তাহা তরঙ্গমালী সমুদ্রসহিত মিলিত হইয়া এক হয়, কেবল স্থানে স্থানে মৃত্তিকারাশি এক এক উপদ্বীপ

হইয়াছিল। পরে কপিলাশ্রমে অশ্বদর্শন করিয়া সগর পুত্রেরা কপিলের অপমান করাতে তিনি শাপ প্রদান করেন। সেই ব্রহ্ম শাপে তাঁহারা তথায় নিহত হন। অনন্তর সগরের পৌত্র অসমঞ্জাপুত্র অংশুমান কপিলাশ্রমে গিয়া বিহিত বিনয় ও বিনতিদ্বারা কপিলকে প্রসন্ন করতঃ অশ্বানয়ন পূর্ব্বক পিতামহের সংকল্পিত যজ্ঞ সমাপন করেন।

কিছুদিন অতীত হইলে দিলীপ নামে অংশুমানের এক পুত্র জন্মে। তাঁহার পুত্র ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে অবনীতে লইয়া আইসেন। আকাশ সমুদ্রের নাম সোম। সেই সোম নামক সমুদ্র হইতে পুণ্য সলিলা আকাশগামিনী গঙ্গা উদ্ভূতা হইয়াছেন।

বর্ত্তমান হরিদ্বার এবং মায়াপুরের ভগ্নাবশেষ গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। সিবালিক পর্ব্বতের নিম্নদেশস্থ একটী ছিদ্র দিয়া নদী প্রবাহিত। নদীটি সম্পূর্ণ ছিদ্র জুড়িয়া আছে। ছিদ্রের স্বল্পাতিস্বল্প স্থানটী এক মাইল। এই স্থানে গঙ্গা অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়াছেন। বাম দিকে চণ্ডি পাহাড়। পর্ব্বতের শীর্ষদেশে একটি মন্দির অবস্থিত।

পূর্ব্বোক্ত মায়াপুরের সীমানা সওয়া তিন মাইল। এককালে ইহা বহুজনাকীর্ণ ছিল। এক্ষণে ইহা ভগ্নদশাগ্রস্থ। ইহার মধ্যে বেন রাজার দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। দুর্গটী ৭৫০ বর্গফিট। ঐ স্থানে তিনটী পুরাতন মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী নারায়ণশীলা, দ্বিতীয়টী মায়াদেবীর এবং তৃতীয়টী ভৈরবের। মায়াপুরের বহিস্থ সীমায় "পাইরী" ঘাট অবস্থিত। এখানে পাদপদ্মের অস্তিত্ব নিবন্ধনই ঘাটটী "পাইরী ঘাট" নামে আখ্যাত। স্থানটী যে অতি পুরাতন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পাইরী ঘাটের আড়াই মাইল নিম্নে নদীতটে একটি পুরাতন মন্দির আছে; তাহা দক্ষেশ্বর নামে খ্যাত। এই স্থানেই দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল। প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। মহাদেব ব্যতীত সকল দেবগণই সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। সেই যজ্ঞে মহাদেবের যজ্ঞভাগ কল্পিত হয় নাই শুনিয়া পার্ব্বতী যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হয়েন। ভূতভাবন, ভবানীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া নন্দীরে কৈলাসে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া যোগবলে স্বীয় অনুচর সমভিব্যাহারে দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক যজ্ঞধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাদেবের অনুচরগণ উপদ্রব আরম্ভ করিলে দেবতারা তদ্দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া দশদিকে ধাবমান হইলেন। বসুমতী পরাক্রান্ত মহাপুরুষদিগের পদভরে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সমুদায় জগৎ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল। অবশেষে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান ভবানীপতির যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলে তিনি শান্তিশর প্রীতমনে শান্তিবিধান করিলেন।

নারায়ণ শালার মন্দিরটী ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ৯॥ ইঞ্চি। ইহার ঘনত্ব ২॥ ইঞ্চি। মন্দিরের বাহিরের দিকটা জমাট করা। ইহার চতুর্দ্দিকে অনেক ভগ্নমূর্ত্তি দেখা যায়, তন্মধ্যে একটি বৌদ্ধমূর্ত্তিও আছে। মায়াদেবীর মন্দিরটী সম্পূর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত। প্রায় সাতশত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে মায়াদেবীর বিগ্রহ অবস্থিত। উঁহার তিনটী মস্তক, এবং চারিটী

হয়। সম্মুখে নিপতিত অসুরকে বধ করিতে-ছেন। দেবীর এক হস্তে চক্র, অন্য হস্তে ত্রিশূল এবং অপর হস্তে নৃমুণ্ড। ভাগবতে ইনি মায়া-দেবী নামে খ্যাত। ইনি বিশ্বজননী দুর্গামূর্ত্তি। বিষ্ণু ইঁহাকে চক্র এবং মহাদেব ইঁহাকে ত্রিশূল দিয়াছেন। মন্দিরের বাহিরে একটি লিঙ্গমূর্ত্তি এবং নন্দী ষাঁড়ের মূর্ত্তি অবস্থিত। আধুনিক শরভনাথের মন্দিরের বহির্ভাগে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, মূর্ত্তিটী বোধীবৃক্ষের তলে ধ্যানে নিমগ্ন, সঙ্গে দুইটীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান দুইটী উড্ডীয়মান। নিম্নের চক্রখানি দুইটী সিংহদ্বারা বাহিত হইতেছে। মূর্ত্তিটী নগ্ন। ইহাই আদিবুদ্ধের মূর্ত্তি।

হরি-কি-চরণ নামক স্নানঘাটটী বড়ই বিখ্যাত। তত্র সংলগ্ন একটি মন্দির আছে তাহা গঙ্গাদ্বার নামে খ্যাত। আসল বিষ্ণুপদ চিহ্ন এখানে নাই, যাহা আছে তাহা নকল। সন্নিকটবর্ত্তী মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড নামে একটি কূপ আছে। যোগের সময় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান বড়ই পুণ্যজনক। সুতরাং এখানে ভয়ানক ভীড় হইয়া থাকে। জনতার মধ্যে পতিত হইয়া অনেকেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৮১৯ সালের যোগের সময় ৪৩০ জনের এইরূপ মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া বর্ত্তমান ঘাটটি ইংরাজসরকার তৈয়ার করিয়া দেন। বর্ত্তমান ঘাটটিতে ৬০টি সিঁড়ি আছে। ঘাটটি ১০০ ফিট্ চওড়া। Captain De Bude সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই ঘাটটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নদীটি খরস্রোতা বলিয়া উক্ত ঘাটে স্নান করিতে যাহারা সাহস করে না তাহাদিগকে দুই পার্শ্বে দুইজন ব্রাহ্মণ ধরিয়া জলে নামায়। ঘাটটী ৪ ফিটের অধিক গভীর নহে বলিয়া অধিকাংশ নরনারীই বিনা সাহায্যে স্নান করিয়া থাকে। প্রতি বৎসরে বৈশাখ মাসে এখানে মেলা হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে কুম্ভমেলার পালা আইসে। এই সময়ে তীর্থযাত্রীর ভীড় ভয়ানক হয়। কুম্ভমেলায় প্রায় আড়াইলক্ষ লোক সমাগত হইয়া থাকে। অর্দ্ধকুম্ভের পালা প্রতি ষষ্ঠবৎসরে পড়ে। ইহাতেও প্রায় একলক্ষ লোক জমা হয়। হরিদ্বার হইতে অনেক যাত্রীই কেদারনাথ ও বদরিনাথে গমন করে। কেদারনাথ শৈব মন্দির এবং বদরিনাথ বৈষ্ণব মন্দির। দুইটী স্থানই British Garhwal এ অবস্থিত। তীর্থসেবিগণ দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ এবং বিষ্ণুপ্রয়াগ দর্শন করনান্তর স্বীয় স্বীয় গৃহে প্রত্যাগত হয়। উক্ত প্রয়াগগুলিতে দুইটী করিয়া নদীর সঙ্গম আছে।

হরিদ্বারের মাহাত্ম্য পাণ্ডবদিগের সময় হইতেই অধিক হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে প্রতিবৎসরে যে দিনে হরিদ্বারে মেলা হয় সেই দিনে গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে আগমন করেন। বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জাব এবং রাজপুতনা হইতেই অধিকাংশ যাত্রী হরিদ্বারে আইসে। তাহাদিগের এক কার্য্যে দুই কার্য্য হইয়া থাকে। প্রথমতঃ তীর্থ-দর্শন এবং দ্বিতীয়তঃ বনিজ দ্রব্যাদি ক্রয়। মেলার সময় ঘোড়া, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে।

১৩৯৮ খৃঃ অব্দে তৈমুর হরিদ্বার ধ্বংস করেন। কিন্তু আকবর হরিদ্বারে টাকশাল স্থাপন করেন। ১৭৬০ সালে বৈরাগী এবং গোঁসাই দিগের মধ্যে মহা সঙ্ঘর্ষ হয়। সেই যুদ্ধে বৈরাগীপক্ষের ১৮০০ লোক হত হয়। পুনরায় ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে গোঁসাইগণের সহিত শিখযাত্রীদিগের সঙ্ঘর্ষ হয়। ফলে ৫০০ গোঁসাই মারা পড়ে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

অশোক-কথা ।

কোন্ বরণে ফুল ফুটিত
    অশোক-বনে,
নীরবে বসে কাঁদ্‌তে সীতা,
    আপন মনে ?
তোমার থেয়ে মিলনগীতি
হয় ত পেত অশোক-বীথি,
পুষ্পে দিত প্রাণের প্রীতি
    যেত বরণে !
অশোক, সে ত' শোক জানে না ।
    সুখ-স্মরণে !

যখন রামের কুণ্ঠা দেখি,
    অসীম দুখে
মৃত্যু লাগি' পড়্‌লে জ্বালা
    আগুন-বুকে,
অশোক ও সে শিউরে' উঠে'
কইল—'আহা' ! বক্ষ ফুটে,
ছুট্‌ল বায়ু ব্যথায় লুটে,
    দিগঙ্গনে !
সেই হ'তে সে রক্তমাখা
    এ লয় মনে ।

শ্রীসুধেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

—•—

বিধির বিধি ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় আজও মহেশ চাটুয্যে দুর্ব্বল ক্ষীণ শরীরে রুগ্নশয্যায় দেহ ঢালিয়া পড়িয়াছিলেন। কন্যা একবার করিয়া পিতার পরিচর্য্যা ও একবার করিয়া গৃহস্থালীর কাজ করিতেছিল। প্রত্যহ যেমন প্রভাত হয়, আজও ঊষারাণী তেমনি করিয়াই আলোক-ছটায় এই দরিদ্র-কুটিরের অন্ধকার মোচন করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্য তেমনিই তীক্ষ্ণছটার মাথার উপর উঠিয়াছে। কেবল দৈনন্দিন দুঃখ দারিদ্র্য বরং আর একপাদ বর্দ্ধিত হইয়া দেখা দিয়াছে ; নতুবা আজ এই দুঃখ-ক্লিষ্ট পিতা-পুত্রীর কাছে অন্য দিনের ন্যায় সামান্য পার্থক্যের রেখাও মনে আভাসমাত্র দেয় নাই। এই শোকতাপদারিদ্র্যবর্দ্ধিত সংসারটুকুতে আনন্দের আশামাত্রেরও প্রবেশ-পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

আহারের পর প্রভা পিতাকে ভাগবত শুনাইতে শুনাইতে বাহিরে হরকুমার ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনিল। এই বিপদের দিনে ইনিই এক-মাত্র বিপন্নবান্ধব ছিলেন। প্রভা বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল "ঘরে আসুন, জ্যোঠা মশায় !" গৃহেপ্রবেশ করিয়া হরকুমার বলিলেন, "দেখ তো, প্রভা ! কা'কে এনেছি" প্রভা তৎক্ষণে গলায় অঞ্চল দিয়া জ্যোঠামহাশয়কে প্রণাম করিতে যাইতেছিল, চক্ষু তুলিয়া দ্বারের দিকে অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া মুখে ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে সেই সুন্দর নধরকান্তি তেজঃপূর্ণ দেহের প্রতি চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, 'কে ইনি ? কই আরতো কখনো এঁকে দেখিনি !"

চাটুয্যে মহাশয় নবীন অতিথির প্রতি

চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হর, উনি কে? আমার মত হতভাগ্য দীনহীনের ঘরে কে মহাত্মা আজ দয়া করে পদধূলি দিতে এসেছেন? প্রভা, আসন দাও মা, তোমার জ্যেঠামশায়কে এঁকে বস্‌তে দাও!"

হরকুমার উত্তর দিলেন, "ব্যস্ত হয়ো না, বল্‌ছি। জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলে ইনি কে? বল্লে কি বিশ্বাস করবে? ইনি তোমার বৈবাহিক——" হরকুমারের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মহেশচন্দ্র বলিলেন "জমীদার রাধাকান্ত!" হরকুমার বলিলেন, "ঠিক বলেছ, তিনিই বটে। রাধাকান্ত! বৈবাহিকের সঙ্গে আলিঙ্গন কর।" রাধাকান্ত দুই বাহু দিয়া সযত্নে রুগ্নদেহ তুলিয়া বসাইলেন, অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিয়া সেই মলিন শয্যারই একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আনন্দে আবেগে মহেশচন্দ্রের চক্ষুদিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি গদগদ কণ্ঠে দুই হাত জোড় করিয়া বলিলেন "ন্যায়বান্ দয়াল ধার্ম্মিক উদার মহাপুরুষ! তোমায় আমি কি বল্‌ব—আমার মুখে এমন কথা আস্‌ছে না, যাতে মনের কথা তোমায় বল্‌তে পারি।" "কিছু বলবার আবশ্যক নেই, ভাই! আজ আমরা দুজনে এক মায়ের সন্তান। সুতরাং ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের কৃতজ্ঞ হবার কি কারণ থাক্‌তে পারে? আমি মা পেয়েও মার কোল পাইনি, আজ তাই মাকে নিতে এসেছি। এদিকে এস মা!"

তেমনিই গলদশ্রু লোচনে পিতা ডাকিলেন "আয়, প্রভা! প্রণাম কর্। নে ওই তোর পিতা, ওই তোর মাতা। আজ ঈশ্বর তোর ভাবনা থেকে আমার মুক্তি দিলেন। আঃ ভগবান! কে বলে এ দুরন্ত কলিতে তুমি নিদ্রিত—ভক্তের করুণ ক্রন্দন আর তোমার কর্ণে পৌঁছায় না? তোমার দীনহীনের আকুল আহ্বান আজ সার্থক হল। তুমিই সত্য, জগতে একমাত্র তুমিই সত্য, ঠাকুর!" যুক্ত করে বার বার মহেশচন্দ্র ভগবদুদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া লজ্জায় আনন্দে প্রভা অন্তরে বাহিরে কাঁপিতেছিল। পিতার আহ্বান সত্বেও তার পা উঠিতেছিল না, কেবলি মনে আসিতেছিল, 'আজ মা কোথায়?' হরকুমার হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া আসিলে প্রভা তখন ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুজনদের প্রণাম করিল। আশীর্ব্বাদ করিয়া রাধাকান্ত বলিলেন, "ঠাকুর মশাই! সুরেন কোথায় গেল? তাহাকে ডাকুন, সে শ্বশুরকে প্রণাম করুক্!" মহেশচন্দ্র বলিলেন, "এসেছেন? সুরেনও এসেছেন। ডাকুন, ডাকুন, আমি আর একবার চোখ ভরে দেখি!" এবারও হরকুমার ঠাকুরই সুরেনকে গৃহে লইয়া আসিলেন। এত লজ্জাসত্বেও প্রভা ঘোমটার ভিতর হইতে চোখ তুলিয়া চাহিল—সেই মূর্ত্তিই বটে! আজ সত্যই প্রভার দুঃখ-রজনীর অবসান হইল। প্রণত জামাতাকে পাশে বসাইয়া সহস্র আশীর্ব্বচনে চক্ষের জলে সিক্ত করিয়া, মহেশ চন্দ্র বলিতে লাগিলেন "আর যে এ-মুখ দেখ্‌ব সে আশা তো ছিল না; তবু এত দুঃখ-তাপেও প্রাণ ছিল বলে আমি আবার তোমায় দেখ্‌লাম; কিন্তু তোমার অভাগী শাশুড়ীর ভাগ্যে আর হল না!"

মাতৃ-শোকে প্রভার মন পূর্ব্ব হইতেই

কাঁদিতেছিল, পিতার কথায় সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পুত্রবধূর মাথায় হাত রাখিয়া রাধাকান্ত বলিলেন, "মা! যার কোলের মেয়ে মা-হারা হ'য়ে কাঁদ্‌ছে তার কি মায়ের জন্যে এখন কান্না সাজে? চল মা। তোমার জন্যে সে যে দুয়োরে এসে বসে আছে। বেহাই! অনুমতি করুন, যাত্রার আয়োজন করি।"

বাহিরে এক সঙ্গে নানা রকমের বাদ্যরোল উঠিল। শশব্যস্তে গ্রামের লোক চাটুর্য্যে মহাশয়ের বাটীর দ্বারে আসিয়া জমা হইল— ব্যাপার কি? জমীদার বাড়ীর দেওয়ানজী উত্তর দিলেন, "জমীদার রাধাকান্ত বাবু তাঁর বৌ নিতে এসেছেন।"

একজন অপরের প্রতি চাহিয়া বলিল, "কি রকম হোল? জমীদার রাধাকান্ত চাটুয্যে মশায়ের বেহাই হলেন!"

"সেই রকমই তো দেখ্‌ছি, ভায়া! কিসে কি হয়, কিছু বলা যায় না। কিং ন কুর্য্যাৎ যদি বিধিঃ তুষ্টঃ।"

"তবে দুঃখ যে তোমার আমার ভাগ্যে বিধি এমন তুষ্ট হল্‌না; যাহক্‌ চাটুয্যে মশায়ের এত দুঃখের পরেও বিধির বিধানটা ফল্‌লো ভাল।"

নলীবালা দেবী।

ইতিহাসে রমণী।

ইংলণ্ডের দক্ষিণে ফরাসীদেশ। দুই দেশের মধ্যে সমুদ্র। এই দশ কিম্বা বার ক্রোশ প্রসারিত নীল জলটুকু মাঝে না থাকিলে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যরূপ মূর্ত্তি হইত।

বৃটেন বা ইংলণ্ড্‌ জয় করিবার পূর্ব্বে রোমানরা ফরাসীদেশের প্রাচীন অধিবাসী-দিগকে পরাজিত করিয়া দেশটি আপনাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। ফরাসী-দেশের পূর্ব্বদিকে জার্ম্মাণ-দেশ। যখন রোমানরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন পূর্ব্বদিক্‌ হইতে ফ্রাঙ্ক্‌-নামে একটি দুর্দ্দান্ত জাতি আসিয়া ফরাসীদেশ আক্রমণ করিল। কালে ইহারাই দেশটিকে জয় করিয়া লয় এবং ইহা-দেরই নাম-অনুসারে দেশের নাম ফ্রান্স্‌ বা ফরাসীদেশ হয়।* পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল গল্‌।

ফ্রাঙ্ক্‌গণ প্রথমে আসিত দেশ-লুণ্ঠনের আশায়। রোমানগণ তখন বলহীন। ফরাসী-দেশের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়। বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই সময় ফ্রান্সের এখনকার রাজধানী পারী-সহরের নিকটে একটি ছোট গ্রামে জেনেভিয়েভ্‌ নামে একটি বালিকার জন্ম হয়। বালিকার পিতা চাষ ও পশুপালন করিতেন। জেনেভিয়েভের হৃদয়ে অল্প বয়সেই ধর্ম্মভাব জাগিয়াছিল। একবার একটি প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-যাজক বা পুরোহিত সেই গ্রামের মধ্য দিয়া অন্য স্থানে যাইতেছিলেন। তিনি বালিকার ধর্ম্মভাব দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, যাইবার সময় তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একটি তামার পদক দিয়া

---

* ফরাসীদেশের অধিবাসী এই ফ্রাঙ্করাই এসিয়াখণ্ডে ফিরিঙ্গী নামে পরিচিত। এসিয়াবাসী ইহাদের বীর্য্য দেখিয়া ইউরোপের সমস্ত শ্বেতকায় অধিবাসীদিগকে ফিরিঙ্গী নাম দিয়াছিল।

গেলেন। পদকটির উপর খ্রীষ্টানদিগের পবিত্র 'ক্রুশ' চিহ্ন খোদাই করা ছিল।

বয়সের সহিত জেনেভিয়েভের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বাড়িতে লাগিল। তাঁহার পিতার একটি মেষপাল ছিল। জেনেভিয়েভ্ প্রত্যহ ভেড়াগুলিকে চরাইবার জন্য লইয়া যাইতেন। পশুগুলি মাঠে চরিত, তিনি গাছের তলায় বসিয়া ভেড়ার লোম পিঁজিয়া পশম তৈয়ারী করিতেন। এরূপ কাজের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার মন সকল সময় ভগবানের চিন্তায় ডুবিয়া থাকিত।

তাঁহার মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার ধর্ম্মমা'র নিকট গিয়া থাকিলেন। উপাসনা, প্রার্থনা দীন-দুঃখীকে দান—এই সব লইয়াই তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত। তাঁহার বয়স যখন আটাশ বৎসর, তখন ভীষণ বন্যার মত প্রচণ্ড বেগে হূণগণ ফরাসীদেশ আক্রমণ করিল। তাহাদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা বর্ণনা করিবার নহে। লোকে প্রাণভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। কিন্তু জেনেভিয়েভের মনে ভয়ের উদয় হয় নাই। তিনি সকলকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন যে যদি তাহারা ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে এবং আপনাদের বাসস্থান রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করে, তবে তাহাদের কোনও বিপদ্ হইবে না। মানুষের মনে একবার ভয় ঢুকিলে সে ভয়কে তাড়ান সহজ নয়! তখন লোকের মনের অবস্থা যেরূপ তাহাতে অনেকে তাঁহার এই হিত-উপদেশে কান দিল না, বরং তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইল। এমন সময় যে ধর্ম্মযাজক জেনেভিয়েভকে পবিত্র ক্রুশ-চিহ্নযুক্ত পদক দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারই নিকট হইতে জেনেভিয়েভকে দিবার জন্য একটি উপহার লইয়া একজন পুরোহিত আসিলেন। ইহাতে সকলের স্মরণ হইল যে, তিনি সামান্য রমণী নহেন, যে-হেতু দেশের একজন বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করেন। তখন সকলে জেনেভিয়েভের উপদেশ শুনিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের যুদ্ধ করিতে হইল না, কারণ, হূণসৈন্য এক মহাযুদ্ধে হারিয়া গিয়া গল্ (বা ফ্রান্স্) ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

তথাপি ফ্রান্সের বিপদ্ শেষ হইল না। ফ্রাঙ্ক্ জাতি এইবার দেশটি জয় করিয়া লইয়া তথায় বাস করিবার ইচ্ছা করিতেছিল। তাহারা আবার দেশ আক্রমণ করিতে লাগিল ও ক্রমে পারী নগরীর নিকটে উপস্থিত হইয়া জয় করিবার উদ্দেশ্যে উহার চারি দিক্ ঘিরিয়া বসিয়া রহিল। নগরীর খাদ্যদ্রব্য ফুরাইয়া আসিল। অনাহারে কাতর হইয়া নগরবাসী হাহাকার করিতে লাগিল। অসহায় শিশু ও রমণীগণের দুরবস্থা দেখিয়া জেনেভিয়েভ্ স্থির থাকিতে পারিলেন না। পারী-নগরীর পার্শ্ব-দিয়া সেন্ নদী প্রবাহিত। জেনেভিয়েভ্ কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া নৌকাযোগে নগরী ত্যাগ করিয়া গলের অন্যান্য নগরে গেলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত পারী-নগরীর অধিবাসীদিগের জন্য সাহায্য চাহিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফল ফলিল। নৌকা-যোগে প্রয়োজনীয় খাদ্য নগরে পাঠান হইল।

পারী কয়েক দিনের জন্য রক্ষা পাইল বটে কিন্তু একদিন ফ্রাঙ্ক্ সেনা নগরী অধিকার করিয়া লইল। জেনেভিয়েভ্ তখন সেখানে

উপস্থিত ছিলেন না। তিনি শুনিলেন, শত্রুগণ কয়েক জন প্রধান নগরবাসীকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে এবং শীঘ্রই তাহাদিগকে হত্যা করিবে। সংবাদ শুনিয়া তিনি ভীত হইলেন না। তিনি নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফ্রাঙ্ক-দিগের নেতার নিকট উপস্থিত হইলেন। নেতা তাঁহার সাহস দেখিয়া ও কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং তিনি যাহা বলিলেন তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। যাঁহারা বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহারা এইরূপে রক্ষা পাইলেন এবং নগরবাসী সকলেই বিপন্মুক্ত হইলেন।

ইহার পর তাঁহার জীবন ধর্ম্মকর্ম্মে অতি-বাহিত হইল। উপাসনা ও দান তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। উননব্বই বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহারই চেষ্টার ফলে পারী রক্ষা পাইয়াছিল। নগরীর অধিবাসী তাঁহার স্মৃতি ভুলিল না। ক্রমে ক্রমে সকলের ধারণা হইল যে তিনি স্বর্গে থাকিয়া সমস্ত আপদ্ বিপদ্ হইতে নগরীকে রক্ষা করেন—তিনিই নগরীর রক্ষাকর্ত্রী দেবী। জ্বর, মহামারী, অতিবৃষ্টি, অনা-বৃষ্টি প্রভৃতি যে কোন দৈব-দুর্ঘটনা উপস্থিত হউক্ না কেন, লোকের বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার কৃপা-কটাক্ষপাতে সমস্ত বিপদ্ কাটিয়া যাইবে; তাহারা ভাবিত তাঁহার সমাধি-মন্দিরে প্রার্থনা করিলে, তাঁহার নাম স্মরণ করিলে, তিনি সকল ব্যাধি হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবেন, সকল দুশ্চিন্তা হইতে তাহাদিগকে ত্রাণ করিবেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী-রাজ পঞ্চদশ লুই দারুণ রোগে শয্যাশায়ী হন। তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। পারীর অধিবাসি-সকলে নতজানু হইয়া রাজার আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। রাজা সুস্থ হইলেন। সকলে ভাবিল সেন্ট্ জেনেভিয়েভের কৃপায় রাজা নিরাময় হইলেন। রাজার আদেশে বিখ্যাত শিল্পী সুফ্লো (Soufflot) একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পুণ্যবতী রমণীর দেহাবশেষ এইখানে স্থানান্তরিত হয়। নানারূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর এই সমাধি-মন্দিরের নাম প্যান্থিয়ন্ হয় এবং ইহাই দেশের গণ্যমান্য লোকের কবর-স্থান হয়।

প্যান্থিয়ন্-মন্দিরটি নানা চিত্রে শোভিত। কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রকর সেন্ট্ জেনেভিয়ে-ভের জীবনী-সম্বন্ধে চিত্র আঁকিয়াছেন। চিত্র-কর লরেঁ (Jean Paul Laurens) তিনখানি পাশাপাশি ফলকে যে তিনখানি ছবি আঁকিয়া-ছেন, তাহাদিগের মধ্যে পার্শ্বের ফলক-দুই-খানিতে নগরীর আবালবৃদ্ধ-রমণীর প্রতিমূর্ত্তি আছে।—কেহ হেঁটমুণ্ডে বসিয়া রহিয়াছে, কেহ যুক্ত-করে প্রার্থনায় রত; সকলেরই মুখে আসন্ন শোকের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। মধ্য-খানের ফলকটিতে দেখান হইয়াছে,—পুণ্যশীলা রমণী মরণের পথে, বালিশ দিয়া তাঁহার দেহ তুলিয়া ধরা রহিয়াছে, শয্যার চারিধারে নত-জানু হইয়া ভক্তের দল আসীন, তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আর একজন চিত্রকর পারী-নগরীর রক্ষাকর্ত্রীরূপে সেন্ট্ জেনেভিয়েভের মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন।—শীর্ণ দীর্ণ দেহ, মস্তকে ও বক্ষের উপর কৃষ্ণ অঙ্গাবরণ ও একখণ্ড শ্বেত বস্ত্র, ছাদের প্রাচীরের উপর হস্ত রাখিয়া নগরীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। অন্য এক চিত্রকর দেখাইয়াছেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-

শতাব্দীর রোগ-প্রপীড়িত হতভাগ্যগণ কিরূপে দেবীর কৃপাভিক্ষা করিতেছে। তাহাদের গণ্ড রুগ্ন শীর্ণ, চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট। চিত্রের মধ্য-স্থানে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় শবাধার। তাহার মধ্যে জেনেভিয়েভের দেহাবশেষ। এই চিত্রকরের আর একটি চিত্রে দেখান হইয়াছে পঞ্চদশ-শতাব্দীতে পবিত্র শবাধার প্যারী নগরীর রাজপথ দিয়া অতীব ভক্তি ও সমারোহের সহিত বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে, উদ্দেশ্য—যাহাতে জল, বৃষ্টি, তুষার-পাত বন্ধ হইয়া পরিষ্কার দিন ফিরিয়া আসে। এইরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানব পরোপকারিণী পবিত্রচেতা রমণীর পূত স্মৃতির পূজা করিয়া আসিতেছে। এইরূপ পূজা-দ্বারা মানব আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও আপনি ধন্য হয়।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

মাতা ও শিশু।

আমরা সকলেই আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করিবার জন্য যুবকগণের শিক্ষা-দীক্ষা-সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা করিয়া থাকি এবং যাহাতে গবেষণা কার্য্যতঃ ফলপ্রদ হয়, তাহার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করি। সমাজ ও দেশের দৃষ্টি যুবা-গণেরই উপর স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহাদের পূর্ব্বতর অবস্থার প্রতি যথোপযুক্ত মনোনিবেশ করা হয় না। কিরূপে যুবক প্রকৃত যুবক হইতে পারে, কিরূপে তাহার দেহ হৃষ্ট-পুষ্ট, পূর্ণায়তন, রোগশূন্য ও কান্তিযুক্ত হইতে পারে, এ-বিষয়ে দেশের জন-সাধারণকে-বিশে-ষতঃ নবীন জননীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে অধিকতর প্রয়োজনীয়, ইহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। ফলে দেশে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের এক্ষণে একান্ত কর্ত্তব্য যাহাতে শিশুদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, যাহাতে তাহারা পৃথিবীতে আসিবামাত্র রোগের কবলে না পড়িয়া সুস্থ-দেহে শিশু-জীবন যাপন করিয়া, অটুট্ জীবনী-শক্তি লইয়া পরবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

মনুষ্য-জীবনে শিশুকাল যে কিরূপ বিপৎ-সঙ্কুল, তাহা দু-এক কথায় বলা যায় না। কিন্তু এই অবস্থাই সমস্ত জীবনের ভিত্তি। পরবর্ত্তি-কালে দেহের ভাল-মন্দ সমস্তই ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি কোন শিশু জন্মাইবার পর হইতেই রোগে ভুগিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং পূর্ব্ব হইতেই জীবনীশক্তির অভাব হওয়ায় পর-বর্ত্তি জীবনে সে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। "Childhood leaves a legacy to the next stage."--অর্থাৎ শিশুকালের ভাল-মন্দের ফলাফল পরে ভোগ করিতে হয়। একথা যথার্থ সত্য। একবার শরীরের প্রকৃতি একরূপ হইয়া যাইলে, উহা ভিন্নরূপ করা প্রায় দুঃসাধ্য। কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত-কালে যদি কোনটি বাঁকা করিয়া ফেলে এবং যদি উহা তখনই ঠিক করিয়া না দেয়, তাহা হইলে উহা

ঐরূপই থাকিয়া যায়; পরে আর উহার সংশোধন করা চলে না। আমাদের জীবনের একমাত্র কুম্ভকার মাতা ও পিতা; এবং শিশুকালের কুম্ভকার কেবলমাত্র মাতাই। সুতরাং নবীনা জননী যাহাতে প্রকৃত কুম্ভকারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহার প্রস্তুত হইয়া থাকা উচিত। এরূপ না করিলে তিনি যে কেবলমাত্র মাতৃত্বের অবমাননা করিবেন, তাহা নহে, সমগ্র দেশের ও জাতির নিকট তিনি দোষী হইবেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় নবীন জননীদিগের উপদেশের জন্য লেডি চেমস্‌ফোর্ড অল্ ইণ্ডিয়া লীগ্ ফর্ মেটার্‌নিটী এণ্ড্ চাইল্ড ওয়েল্‌ফেয়ারের (Lady Chelmsford All India League for Maternity and Child-welfare) প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহা হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা এই প্রবন্ধে একে একে জ্ঞাপন করিব।

মনুষ্য-জীবনের প্রথম লীলা-ভূমি সূতিকা-গৃহ। এই স্থানে সুকুমার শিশুর মর্ত্ত্যলোকের সহিত প্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই স্থানে সে পৃথিবীর জল-বায়ুর প্রথম আস্বাদন পাইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালী শিশুর—বাঙ্গালী শিশুর কেন, সমগ্র ভারতীয় শিশুর-এমনই অদৃষ্ট যে প্রথমে বাহ্য জগতের সহিত তাহার সুপরিচয় না হইয়া কুপরিচয়ই হইয়া থাকে। সদ্যোজাত শিশুর বাহিরের দূষিত জল-বায়ুর সহিত যুঝিবার শক্তি অতীব অল্প। এ-অবস্থায় শিশু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন না করে, অপরিচ্ছন্নতার সংস্পর্শে না আসে, তাহার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের দেশে বাড়ির মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ঘর, সেইটি সূতিকা-গৃহ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে-গৃহে ঐরূপ কক্ষ হয় নাই, সেখানে বাড়ির ভিতর যে-স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা অপরিচ্ছন্ন ও স্যাঁৎসেঁতে তথায় বায়ু-চলাচলের পথশূন্য একটি ছোট চালা নির্ম্মাণ করা হয় এবং এইস্থানে প্রসূতি (পোয়াতি) ও শিশু অন্ততঃ ১০ দিন অবরুদ্ধ থাকে। এরূপ প্রথা সম্পূর্ণ হানিকর। বাড়ির মধ্যে যে-টি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, যেখানে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ বায়ুর যাতায়াত আছে, এরূপ কক্ষে শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার স্থান নির্ব্বাচন করা দরকার। ইহা প্রসূতি ও শিশু, উভয়ের পক্ষেই হিতকর। বিশুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্য আনয়ন করে, অবিশুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্য-নাশ করে। সন্তান-প্রসবের পর প্রসূতির শরীর দুর্ব্বল থাকে। এ-সময় তাহাকে বিশুদ্ধ বায়ু জীবনী-শক্তি প্রদান করে এবং শিশুর দেহে নবশক্তি আনিয়া দেয়।

ধাত্রী-সম্বন্ধেও আমাদের দেশে কুপ্রথা প্রচলিত আছে। অনেক স্থানে এক শ্রেণী ধাত্রী সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ ধাত্রীবিদ্যা না জানে, তাহা হইলেও সে ধাত্রী বলিয়া গৃহস্থের গৃহে আদৃতা হয়। ধাত্রী সম্পূর্ণ শিক্ষিতা হওয়া দরকার। সূতিকা-গৃহে (আঁতুড় ঘর) কিরূপে প্রসূতি ও শিশুর পরিচর্য্যা করা উচিত, তাহ তাহার রীতিমত জানা উচিত। কিরূপ অসাবধানতায় কিরূপ বিপৎপাত হইতে পারে, সে-সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা দরকার। ধাত্রী সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অপরিষ্কার কাপড় ছাড়িয়া পরিষ্কার কাপড় পরিধান করিবে; হাতের কনুই পর্য্যন্ত সাবান দিয়া, সাবান অভাবে পরিষ্কার গরম জলদ্বারা উত্তমরূপে ধুইয়া

ফেলিবে। হাতে যদি চুড়ি বা আংটী থাকে, তাহা হইলে তাহা খুলিয়া রাখিতে হইবে। কারণ, চুড়ি প্রভৃতির ভিতর ময়লা মাটি জমিয়া থাকে এবং উহা নানাবিধ রোগের বীজাণু বহন করিতে পারে; তাহা ছাড়া, অসাবধানতা-বশতঃ শিশুর বা প্রসূতির অঙ্গ ছিঁড়িয়া যাইতে পারে এবং ইহার দ্বারা তাহাদের রক্ত দূষিত হওয়া সম্ভব। সন্তান-প্রসব হইবার পর শিশুর দেহ বেশ করিয়া পরিষ্কার নরম নেকড়া দিয়া মুছিয়া দিয়া এবং উহার চক্ষু উত্তমরূপে বিশুদ্ধ জল-দ্বারা ধুইয়া দিয়া শোধিত ছুরিকা বা শোধিত কাঁচি দ্বারা তাহার নাড়ীচ্ছেদ করা উচিত; কদাচ যেন বাঁশের চোঁচাড়ি বা ঐরূপ অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা নাড়ীচ্ছেদ করা না হয়। ইহার পর ইহাকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া গরম কাপড়ে ঢাকিয়া রাখা উচিত, যেন তাহার গায়ে ঠাণ্ডা না লাগে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর কাঁদিয়া উঠে। এইরূপ কাঁদিয়া উঠিলে বুঝিতে হইবে, তাহার কোন হানি হয় নাই। যদি কাঁদিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে শিশুর বিশেষ কিছু হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং দরকার হইলে ডাক্তার আনাইতে হইবে। সন্তান-প্রসব হওয়ার পর ধাত্রীর দেখা দরকার যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিশু মলমূত্র ত্যাগ করিল কি-না। যদি তাহা না করে তাহা হইলে বিশেষ চিন্তার কথা। কারণ, অনেক সময় শিশুর মলমূত্র-দ্বার একেবারে বন্ধ থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা উচিত; বিলম্বে শিশুর প্রাণহানি হওয়া সম্ভব। সূতিকা-গৃহে যে-সমস্ত কাপড়চোপড় ও দ্রব্যাদি দিতে হইবে, তাহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হওয়া দরকার, কারণ, ময়লা জিনিষে অনেক রোগের বীজ থাকে।

অনেকের ধারণা যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার একদিন কি দুইদিন পরে শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। প্রসবের ঘণ্টা-তিনেকের পরে এবং বার ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মাতৃস্তন্য দেওয়া দরকার। ইহা শিশু ও প্রসূতি উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। এই দুধ খাইলে শিশুর মলত্যাগ হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায় এবং সন্তান স্তন্য-পান করার জন্য প্রসূতিরও শরীরের অবসাদ কতক দূর হইয়া যায় এবং মনে স্ফূর্ত্তি জন্মে।

প্রসূতির আহারের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। যাহাতে প্রসূতি সত্বর স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে পারে, এরূপ আহারের ব্যবস্থা করা দরকার। তাহাকে প্রথম ৫।৬ দিন শয্যাত্যাগ করিতে দেওয়া উচিত নহে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে দরজা-জানালা-শূন্য একটী ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। যাহাতে ঘরে প্রচুর পরিমাণে বাতাস খেলে তাহার ব্যাবস্থা করা উচিত। শিশুকেও মুক্ত বায়ু সেবন করিতে দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; তবে যাহাতে তাহার চোখে আলো না লাগে, তাহার জন্য চোখের সম্মুখে একটি আবরণ দেওয়া উচিত। শিশুর চক্ষু খুব কোমল। এ-সময়ে চোখে যত তীব্র আলো না লাগে, ততই ভাল। দশ এগার দিন পরে প্রসূতির দেহে কিঞ্চিৎ বলসঞ্চার হইলে, তাহাকে মুক্ত বাতাসে চলা-ফেরা করিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে শরীরের অবসাদ দূর হয়।

পাশ্চাত্ত্য দেশে ধাত্রী-দ্বারা শিশুপালনের প্রথা আছে। ও-সব দেশে মাতা একরূপ

শিশুর পরিচর্য্যা-কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকেন। আমাদের দেশে অনেক ধনিগৃহে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রথা কোন মতে ন্যায়সঙ্গত নহে। মাতা যেরূপ শিশুর প্রতি হৃদয় ঢালিয়া স্নেহ-যত্ন করিবেন, সেরূপ অকৃত্রিম স্নেহ অপরের নিকট কিছুতেই আশা করা যাইতে পারে না। শিশুর নিজের অভাব অভিযোগ জানাইবার ক্ষমতা থাকে না। তাহার কিসে অসুবিধা হইতেছে, কিসে কষ্ট হইতেছে, ইহা বলিবার সাধ্য তাহার নাই। একমাত্র কান্নাই তাহার সম্বল—কান্নাই তাহার কেবলমাত্র ভাষা। এ-ভাষা বুঝা ধাত্রীর কার্য্য নহে। অপত্য-স্নেহের বন্ধন-দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ শিশুর অন্তঃকরণের সহিত একসূত্রে বদ্ধ না হইয়াছে, তিনি ব্যতীত কেহ শিশুর রোদনের অর্থ বুঝিতে সমর্থ নহেন। মাতাই কেবলমাত্র এ-কার্য্যের উপযোগিনী। ধাত্রী যতই স্নেহ করুক্ না কেন, সে কখন "এ শিশু আমার, আমারই গর্ভ হইতে সম্ভূত, ভবিষ্যতে আমারই সহায় ও অবলম্বন" এইরূপ ভাবিতে পারে না। এইরূপ পারে না বলিয়াই মাতার সহিত তাহার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তাহা ছাড়া অনেক ধাত্রী নীচজাতি হইতে সংগৃহীত হয়। তাহাদের শরীরে নানারূপ ব্যাধি থাকিতে পারে। এই ব্যাধি ক্রমশঃ শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, মাতাপিতার কোনরূপ দোষ না থাকা সত্ত্বেও শিশু অনেক কুৎসিত রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। এ-সব ক্ষেত্রে ধাত্রীই ঐ সব রোগের একমাত্র কারণ। ইউরোপীয়-গণ ধাত্রী নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে তাহাকে ডাক্তার-দ্বারা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করাইয়া লয়। আমাদের পক্ষে সেরূপ সম্ভবপর নহে। সম্ভব হইলেও আমরা অতদূর সাবধান হওয়া দরকার বোধ করি না। সুতরাং, পাশ্চাত্ত্য প্রথা অনুকরণ করিতে গিয়া বিনা কারণে নিজেদের বিপদগ্রস্ত করার কি প্রয়োজন? মাতাকেই শিশু-পালন করিতে দেওয়া উচিত। নবীন-জননী অনভিজ্ঞা হইলেও ধাত্রী অপেক্ষা তাঁহার দ্বারা পরিচর্য্যা নিরাপদ্।

শিশু-পালন-ব্যাপারে শিশুর আহার-সম্বন্ধে ব্যবস্থাই প্রধান। কি নিয়মে খাওয়াইলে শিশুর শরীর সুস্থ থাকিবে এবং দেহ হৃষ্ট-পুষ্ট হইবে, তাহা সকলেরই জানা দরকার। সব বিষয়ে একটা নিয়ম থাকা আবশ্যক। এই বিশ্ব-জগৎই নিয়মের বশীভূত। নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইলেই মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত হয়। শিশুদেহ সামান্য হইলেও উহা এই জগতেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এখানেও যে একটা নিয়ম থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শিশুকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্তন্য পান করান উচিত। যখনই শিশু কাঁদে তখনই অনেক মাতা ক্ষুধা পাই-য়াছে ভাবিয়া তাহাকে স্তন্য দিয়া থাকেন। এরূপ করা খুবই অন্যায়; শিশু যে কেবল ক্ষুধা পাইলেই কাঁদে, তাহা নহে। আবার কোনরূপ অসুবিধা হইলে বা তাহার তৃষ্ণা পাইলেই সে কাঁদিয়া উঠে। চারিমাস পর্য্যন্ত শিশুকে তিন ঘণ্টা অন্তর স্তন্য দেওয়া উচিত। স্তন্যদানের সময় নিম্নলিখিত রূপ হইলে সুবিধা-জনক হয়। যথা—৬টা, ৯টা; মধ্যাহ্ন ১২টা; অপরাহ্ণ ৩টা, ৬টা, এবং রাত্রি ১০টা। প্রথম দুই তিন সপ্তাহ ব্যতীত শিশুকে রাত্রি ১০টার পর আর স্তন্য দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। রাত্রি শিশু ও মাতার নিদ্রার জন্য এবং এ-সময়ে উভয়েরই গভীর নিদ্রা যাওয়া প্রয়োজন। শিশু-

রাত্রি ১০টা হইতে প্রাতঃকাল ৬টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইবে। যদি ইহার মধ্যে সে কাঁদিয়া উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার কোন-রূপ ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, কিংবা তাহার তৃষ্ণা পাইয়াছে। পিপাসা পাইয়াছে বুঝিতে পারিলে, তাহাকে এক আধ চামচ্ সামান্য গরম জল * পান করিতে দেওয়া উচিত। চারি মাস পরে এবং বলিষ্ঠ শিশু হইলে তাহারও পূর্ব্বে, স্তন্য দেওয়ার মাত্রা ৬বার হইতে ৫বারে কমান উচিত এবং উহার সময় এইরূপ করা যাইতে পারে।—প্রাতে ৬টা ও ১০টা; অপরাহ্নে ২টা এবং ৬টা এবং রাত্রি ১০টা। শিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময় এক একবারে এক একটি করিয়া স্তন দেওয়া উচিত। তবে যদি স্তনে দুধ অল্প থাকে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া এক সময়ে দুইটিই পান করাইতে হইবে। এক একবারে এক একটা স্তন পান করাইতে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, শিশু যে-স্তনটী পান করিতে আরম্ভ করিবে, সেইটির দুগ্ধ সে যেন সম্পূর্ণরূপে পান করিয়া ফেলিতে পারে। স্তন সম্পূর্ণরূপে দুগ্ধশূন্য হইলে পুনরায় শীঘ্র উহাতে দুগ্ধ সঞ্চার হইতে থাকে। স্তনের দুধের শেষ ভাগে বেশী পরিমাণে চর্ব্বী থাকে; সুতরাং যদি শিশুকে একটি স্তন সম্পূর্ণরূপে পান করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে পুনরায় যখন সে ঐ স্তন পান করিবে, তখন তাহাকে প্রথমেই সেই অধিক-চর্ব্বীযুক্ত দুধ পান করিতে হইবে। ইহাতে তাহার উদরাময় (পেটের অসুখ) ও অম্ল (অম্বল) হইতে পারে। শিশুকে এককালে পনর হইতে বিশ মিনিট পর্য্যন্ত স্তন পান করিতে দেওয়া উচিত। দিনের বেলায় দুধ পান করার সময় শিশু যদি ঘুমাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ধীরে ধীরে জাগাইয়া দুধ পান করান উচিত। ইহাতে কোন ক্ষতি হয় না। মাতা যখন শিশুকে স্তন্য দিবেন, তখন যেন তিনি কোন রূপ অন্যমনস্কা না হন। অনেক মাতা শিশুর মুখে স্তন দিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। ইহাতে শিশুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হওয়ায় সে বারবার কাঁদিয়া উঠে। কিরূপ-ভাবে থাকিলে শিশু স্বচ্ছন্দভাবে দুধ পান করিতে পারে, তাহা মাতার সর্ব্বতোভাবে দেখা কর্ত্তব্য।

মাতার স্তনে যদি দুধ না থাকে, কিংবা যদি প্রসবের পর প্রসূতির মৃত্যু হয় বা এমন কোন অঘটন ঘটে, যাহাতে শিশুর মাতৃস্তন্য পান করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে সচরাচর শিশুকে কৃত্রিম উপায়ে Feeding bottle (ফিডিং বোতল) দ্বারা দুধ পান করান হইয়া থাকে। মাতৃ-স্তনের অভাবে এ-উপায় অবলম্বন করা মন্দ নহে; কিন্তু ইহা উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে না পারিলে, উহা হইতে অনেক বিপদ্ হইতে পারে। প্রথমতঃ এরূপ প্রকারের ফিডিং বোতল নির্ব্বাচিত করা উচিত, যাহার সমুদায় অংশ উত্তমরূপে পরিষ্কার করা যাইতে পারে। বোতলের রবার-নলটী ছোট হওয়া দরকার। নল যত বড় হইবে, স্বাস্থ্যের পক্ষে তত বেশী ক্ষতি। কারণ, নল বড় হইলে উহার ভিতর পরিষ্কার করার সুবিধা হয় না, কাজেই উহার ভিতর ময়লা, সরের কুচি, শুষ্ক দুধের শক্ত চটা রহিয়া যায় এবং এই নল-দ্বারা শিশু দুগ্ধ পান করিলে তাহার অম্ল এবং এমন কি ভয়ানক পেটের অসুখও হইয়া থাকে। প্রত্যেক বার দুধ

* জল ফুটানর পর প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে সেই জল দিতে হইবে।

পান করাইবার পর বোতল ও নলটী উত্তমরূপে বুরুশ ও জল ও সোডা (গরম জল দেওয়া উচিত) দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ফেলা উচিত, যেন উহাতে কোনরূপ দুধের দাগ লাগিয়া না থাকে। এরূপ সাবধান না হইলে, অনেক সময় মাতৃস্তন্য-বর্জ্জিত শিশুর পেটের অসুখ প্রভৃতি উদরের পীড়ায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আবার অনেক স্থলে এরূপ শিশুকে অন্ত কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করান হইয়া থাকে। এ-উপায় পূর্ব্বোল্লিখিত কৃত্রিম উপায় অপেক্ষা ভাল বটে, কিন্তু ইহাতেও বিপদ্ আছে। যে স্ত্রীলোকের দুধ পান করান হইবে, তাহার কোনরূপ ব্যাধি আছে কি-না, বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। কোন রোগগ্রস্তা নারীর দুধ পান করিলে শিশুরও সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আবার যদি ঐ স্ত্রীলোক বেশীদিন পূর্ব্বে সন্তান-প্রসব করিয়া থাকে, তাহা হইলে চলিবে না। উহার সন্তান, যে শিশু দুগ্ধ-পান করিবে, তাহারই সমবয়স্ক হওয়া দরকার। তাহা না হইলে উক্ত স্ত্রীলোকের দুগ্ধে চর্ব্বী বেশী থাকায় শিশুর নানা প্রকার উদরের পীড়া হইবে।

শিশুর সহ্য হইলে প্রত্যহই তাহাকে স্নান করান উচিত। ইহাতে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে। স্নান করার প্রধান উদ্দেশ্য শরীরের ময়লা ধুইয়া ফেলা। শিশুর ত্বক্ (চামড়া) খুব কোমল। উহার উপরে ময়লা জমিতে দিলে ত্বকের ক্ষতি হইয়া থাকে। সুতরাং শিশুর দেহ সর্ব্বদা পরিষ্কার ও মসৃণ রাখা দরকার। শিশুকে ঠাণ্ডা জলে স্নান না করাইয়া অল্প গরম জলে স্নান করান উচিত। জলের উষ্ণতা হাতের তলদেশ (হাতের পিঠ) দ্বারা পরীক্ষা করিলে অনেক স্থলে প্রকৃত তাপ জানা যায় না। কারণ, উহা অনেক সময় ঠাণ্ডা থাকে এবং ইহার জন্য তাপ কম বোধ হয়। প্রকৃত তাপ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে হাতের কনুই জলে ডুবাইয়া উষ্ণতা পরীক্ষা করা উচিত। শিশুকে স্নান করাইবার সহজ উপায় একটী অনতিউচ্চ এবং সুপ্রশস্ত টব বা গামলায় জল রাখিয়া সেই জলের মধ্যে তাহাকে বসাইয়া দিয়া, বাম-হাতে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া, ডাইন হাত দ্বারা ধীরে ধীরে ঐ জল তুলিয়া তাহার গায়ে ও মাথায় দেওয়া। এরূপ না করিয়া দুই পা একত্র করিয়া তাহার উপর শিশুকে বসাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গামলা হইতে জল লইয়া উহার মাথায় ও গায়ে দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতেও সুবিধা হয়। শিশুর স্নানে বেশী সময় অতিবাহিত করা উচিত নহে। কারণ, বিলম্ব হইলে তাহার ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। স্নানের পর বেশ করিয়া তাহার গা মুছাইয়া দিয়া তাহাকে জামা পরাইয়া দেওয়া উচিত।

আমাদের দেশে অনেক পরিবারে দেখা যায় যে, মাতা তাঁহার শিশুকে লইয়া একই বিছানায় একই লেপের মধ্যে শুইয়া থাকেন। এরূপ করা শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই খারাপ। শিশুর বিছানা মাতার বিছানা হইতে একটু পৃথক্ থাকা দরকার; কারণ এরূপ না করিলে মাতার প্রশ্বাসের দূষিত বায়ু শিশুর দেহে নিঃশ্বাসরূপে প্রবেশ করিয়া তাহার রক্ত দূষিত করিতে পারে। ইহা ছাড়া মাতা ও শিশুর একটী বিছানায় পাশাপাশি শোয়া হেতু অনেক সময়ে মাতা ঘুমের ঘোরে নিজের

কাপড় চোপড় বা লেপের দ্বারা শিশুকে ঢাকিয়া ফেলেন। ইহাতে শিশুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। শিশুকে মাতার বিছানার পার্শ্বে একটী ছোট পৃথক্ বিছানায় একটী ছোট মশারীর ভিতর শোয়ান উচিত। ইহাতে সে স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারে এবং তাহার স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

নয় মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে শিশুকে স্তন ছাড়ান উচিত। এরূপ না করিলে মাতার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং শিশুরও অপকার হইয়া থাকে। শিশুকে ক্রমে ক্রমে স্তন ছাড়ান উচিত, হঠাৎ স্তন বন্ধ করা উচিত নহে। একদিন তাহাকে স্তন না দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে জল মেশান গরুর দুধ দেওয়া হইল, তাহার পর আবার কয়েক দিন স্তন দেওয়ার পর পুনরায় স্তন বন্ধ করিয়া পর পর দুই দিন গরুর দুধ দেওয়া হইল। এইরূপ করিয়া ধীরে ধীরে শিশুকে স্তন ছাড়ান উচিত। এই সময় হইতে তাহাকে বাটী কিংবা ঝিনুক্ হইতে দুধ পান করিতে অভ্যাস করান দরকার।

এই সময়ের মধ্যে শিশুর দুই একটী দাঁত উঠিয়া থাকে। তাহাকে এখন হইতে শক্ত জিনিষ দেওয়া উচিত। ভাত, ডাল, রুটী, তরকারী অল্প অল্প পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে। ফল-মূলও দু-এক টুকরা করিয়া দেওয়া দরকার; ইহাতে শিশুর মাড়ি শক্ত করে। দুই বৎসরের পর হইতে মাছ-মাংসও দেওয়া যাইতে পারে। শিশুর আহারের সময় চিনি কিংবা সন্দেশ সর্ব্ব-প্রথমে দেওয়া উচিত নহে। ভাত, রুটী, তরকারী, ফল প্রভৃতি দেওয়ার পর মিষ্টি দেওয়া উচিত। কারণ, প্রথমে এরূপ দ্রব্য খাওয়া উচিত, যাহা উদরে যাইলে হজম-কারক রস আপনাপনি ক্ষরিত হইতে থাকে। চিনি কিংবা অন্য কোন-রূপ মিষ্টান্ন প্রথমে খাইলে এরূপ হয় না, বরঞ্চ বিপরীত হইয়া থাকে।

শিশু বড় হইলেও তাহার আহারাদির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেখিতে হইবে সে যেন যখন তখন যাহা তাহা না খায়। তাহারও আহারের একটী নিদ্দিষ্ট নিয়ম রাখিতে হইবে। সেই নিয়ন ব্যতীত অন্য সময়ে বালকের ইচ্ছা-মত তাহাকে খাইতে দিলে পরিণামে তাহার ফল বড়ই অশুভ হইয়া থাকে। বালক সত্বরই কামলা বা ন্যাবা (jauudice) কিংবা অম্লরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। অনেক পরিবারে দেখা যায় মাতা বালকের কান্না থামাইবার জন্য বা তাহার আব্দার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যখন তখন তাহার হাতে সন্দেশ প্রভৃতি লোভনীয় আহার্য্য দিয়া থাকেন। এইরূপ দুই চারিবার দেওয়ার পর বালক বেশ বুঝিয়া যায় যে, কাঁদিলেই সে কিছু খাইতে পাইবে। সুতরাং তাহার কান্না ও ঝোঁকের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া যায়। শেষে সকলেরই অসহ্য হইয়া উঠে। কিছুদিন পরে দেখা যায়, বালকের হাত-পা সরু হইয়া যাইতেছে, মুখখানি অপেক্ষাকৃত পাংশু, চোখ হলদে, বারবার পাতলা দাস্ত হইতেছে ইত্যাদি। আমাদের বাঙ্গালী পরিবারে অনেক বালকেরই এইরূপ পীড়া হইয়া থাকে। নিদ্দিষ্ট সময় ব্যতীত কোনমতেই বালককে খাইতে দিতে নাই। যে মাতা ও পিতা এরূপ করেন, তাহারা মাতা-পিতৃ-রূপী শত্রু বিশেষ।

শিশুজীবনে এইরূপ নানাবিধ অনর্থপাতের জন্য দায়ী কে? বালক বা শিশুর ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি থাকে না। যাহাতে তাহার তৃপ্তি হয়, সে তাহাই আহার করে, যাহাতে তাহার আমোদ হয় সে তাহাই করিয়া থাকে। শিশু যদি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সবই জানিতে পারিবে বা বুঝিতে পারিবে, তাহা হইলে মাতা-পিতার সাহায্যের কোনই প্রয়োজন হইত না। মানুষের শৈশব ও বাল্যকালের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়ী একমাত্র মাতা ও পিতা, বিশেষতঃ মাতা। তাঁহারা অনেক সময় অন্ধ মমতার বশবর্ত্তী হইয়া, কি কর্ত্তব্য কি প্রকৃত শুভ, তাহা একেবারে ভুলিয়া যান। অনেক সময় তাঁহাদের কোন্‌টী ভাল কোন্‌টী মন্দ জানা না থাকায় তাঁহারা অজ্ঞাতভাবে নানাবিধ ভ্রম করিয়া থাকেন। এ ভ্রমের জন্য পরিণামে তাঁহাদেরই অনুতাপ করিতে হয়। শৈশবজীবন সম্পূর্ণভাবে মাতার লালন পালন ও শিক্ষায় গঠিত হয়, সুতরাং প্রত্যেক জননীর মনে করা উচিত, যদি ভ্রমবশতঃ কোন-রূপ কর্ত্তব্যের ত্রুটী হয়, তাহা হইলে তাহার ফলভোগ ভবিষ্যতে তাঁহারই অঙ্কজাত সুকুমার শিশুকেই করিতে হইবে, অন্য কাহাকে নহে। তখন তিনি শত চেষ্টাতেও তাহাকে "নিজ হাতে গড়া বিপদ্" হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না। নবীন জননীগণ স্মরণ রাখিবেন যে, গোলাপ কোরক কীটদুষ্ট হইলে কখনই সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।

শ্রীউমাপদ মৈত্র।

সোণার হার।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যখন মায়াপ্পা আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মনে তখন লোকাচার্য্য ও মুদ্‌কলের কাহিনী জাগিতেছিল। সহসা তাঁহার মনে একটী নূতন কথা উদিত হইল। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিবেন, কিন্তু সে সোণার হার কোথায়? দেবরায়কে ত' তাহার সম্বন্ধে এখন কোন প্রশ্ন করা চলে না। সে সম্বন্ধে আর কে জানিতে পারে? দুর্গা সম্ভবতঃ জানে,—আর জানেন মধুরাও, কারণ তিনিই তাহা লইয়া মুদ্‌কলে গিয়াছিলেন। দুর্গাকে প্রশ্ন করার পূর্ব্বে মধুরাওকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন। কিন্তু মধুরাওকে ত' এখন জিজ্ঞাসা করা অনুচিত। মায়াপ্পা স্থির করিলেন, মধুরাওয়ের সহিত প্রভাতে যখন সাক্ষাৎকার হইবে, তখন তাঁহাকে সোণার হারের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

প্রভাতে মায়াপ্পা মধুরাওয়ের নিকট উপনীত হইয়া দেখিলেন, মধুরাও গৃহতলে উপবিষ্ট, তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া হেম অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, বৃদ্ধ পিতা ক্রোক্রন্দমানা দুহিতার ললাটে ও মস্তকে মৃদু অঙ্গুলী-স্পর্শ করিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতেছেন, যেন গিরিপাদ মূলে আশ্রয়চ্যুত স্রোতস্বতী ক্ষীণ মর্ম্মর শব্দে মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছে এবং নিরুপায় গিরি পাষাণ-অধর রুদ্ধ করিয়া শিলাময় অঙ্গুলী-স্পর্শে তনয়াকে সান্ত্বনা দিতেছে।

মধুরাও মারাপ্পাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হেম আমাকেও কাঁদাইতে চাহে।" মারাপ্পা শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "যিনি গিয়াছেন, তাঁহার জন্ম কাঁদিও না, হেম! যাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহাদের জন্ম চোখের জল কেন।"

হেম স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি। তাহার বুদ্ধি দুর্গার স্থায় তীক্ষ্ণ নহে। তথাপি সে মারাপ্পার উক্তির মর্ম্ম কতকাংশে হৃদয়ঙ্গম করিল। সে পিতার পার্শ্বে ধীরে ধীরে উপবেশন করিয়া বলিল, "আমি আর কাঁদিব না,—কিন্তু যদি দাদার মৃত্যুকালে তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইতাম! তিনি সুস্থ আছেন বলিয়া আমাকে প্রাসাদে পাঠাইয়া দিলেন—তাহার পর—"। হেমের নয়ন আবার অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল।

বালিকার স্ফীতারক্ত নয়ন হইতে নির্গত প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু গলিত ধাতুস্রাবের স্থায় মারাপ্পার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল সমস্ত অপরাধ তাঁহার। উশনা-নিঃক্ষিপ্ত জটা হইতে উৎপন্ন ভুজঙ্গের দংশনে মহাদেবের শ্বেত কণ্ঠ যেমন বিষজর্জ্জর হইয়া গিয়াছিল, আজ শোকার্ত্তা বালিকার প্রতি তপ্তশ্বাস মারাপ্পার সর্ব্বাঙ্গে সেই প্রকার জ্বালা উৎপাদন করিতেছিল। তিনি আপন কণ্ঠমধ্যে একটি অব্যক্ত কুণ্ডলীকৃত বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। হেমকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা না পাইয়া তিনি শুধু বলিলেন, "দুর্গার বিবাহ শীঘ্রই হইবে শুনিয়াছ, হেম?" হেম বিষণ্ণভাবে ঈষৎ অনুযোগের স্বরে কহিল, "আপনিই ত' এ বিবাহ স্থির করিয়াছেন।" হেম হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। মারাপ্পা বলিলেন, "দুর্গার সঙ্গে একবার দেখা করিও। কল্য অপরাহ্ণে সংবাদ আসিয়াছে নাগরাও শীঘ্রই আসিবেন, তাঁহার শরীর এখনও অসুস্থ, তাঁহার বিশ্রামের জন্ম কক্ষের ব্যবস্থা তোমাকেই করিতে হইবে।"

হেম বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

মধুরাও কথা কহিলেন। "মারাপ্পা! কল্য তুমি সভায় উপস্থিত না হইলেই ভাল হইত। সন্ন্যাসী হইয়া রাজকার্য্যে তোমার হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন ছিল না।" মারাপ্পা ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া বলিলেন, "হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই ওরূপ করিয়াছিলাম, প্রয়োজন বুঝিলে পুনরায় হস্তক্ষেপ করিব।" তাহার পর তাঁহাকে উত্তর দানের অবসর না দিয়াই বলিলেন, "মধুরাও! মুদ্কেলের কৃষক-কন্যাকে দিবার জন্ম যে স্বর্ণ-হার লইয়া গিয়াছিলে, তাহা কোথায় রাখিয়াছ?" মধুরাও কহিলেন, "তোমার কন্যার নিকট। আজ সহসা তাহার বিষয় স্মরণে আসিল কেন? সে-হার কি তোমার কন্যাকে দিবে?" মারাপ্পা অন্যমনস্কভাবে প্রথমে বলিলেন, 'হাঁ,' তাহার পর-মুহূর্ত্তেই বলিলেন, "আমার প্রশ্নের যে-উত্তর দিয়াছ, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোমার প্রশ্নের উত্তর সময়ান্তরে দিব।"

মারাপ্পা কন্যার নিকটে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ভাবিতেছিলেন, হেমের কণ্ঠে দেবরায়ের সেই হীরক-মুক্তার হারও ত' দেখিলাম না। সেই হারই বা কোথায়? হেম নিশ্চয় তাহা তুলিয়া রাখিয়াছে—সে যে শুনিয়াছিল, দেবরায়ের সহিত তাহার বিবাহ হইবে না।"

দুর্গা স্বর্ণহারের সংবাদ দিতে পারিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজধানীতে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পর হইতেই দুর্গা সে-হার প্রাসাদে আর দেখিতে পায় নাই। তাহার সাধ্যমত অনুসন্ধান সে করিয়াছিল; প্রকাশ্যে সন্ধান করিতে সে সাহসী হয় নাই।

মারায়া প্রথমে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন, পরে চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিলেন, "হারের অনুসন্ধান যতটুকু পারি করিব। তাহার পর হীরক-হার ত হেমের নিকটেই আছে। তাহা দ্বারা শুভকার্য্য সম্পন্ন করিলেই চলিবে।

ক্রমে দুর্গার বিবাহের দিন সমাগত হইল। মুসলমান শিবির হইতে মীরফজলুল্লা নানাবিধ উপহার লইয়া বিজয়নগরে আসিলেন। দুর্গা একদিন মহাসমারোহের সহিত মুসলমান শিবিরে প্রেরিত হইল। বিবাহের পর আহমদ্ সম্রাটের নিমন্ত্রণে বিজয়নগরে আসিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহার আদর-অভ্যর্থনার ক্রুটি হইল না। যে-দিন খান্‌খানান্ আপন শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন, সে-দিন দেবরায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রাজধানীর উত্তর তোরণের সমীপে আসিয়া তিনি আহমদকে বলিলেন, "সেনাপতি! বিদায় হই।" আহমদ্ নিম্নস্বরে বলিলেন, "সম্রাট! এ অপমানের প্রতিশোধ লইব।" দেবরায় সেইরূপ অনুচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "সেনাপতি! যদি সুলতান ফিরোজ আজ শিবিরে থাকিতেন, তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার শিবির পর্য্যন্তই যাইতাম। সুলতান-ভ্রাতার জন্য এই প্রাচীর পর্য্যন্ত আগমনই যথেষ্ট!" ক্রোধরুদ্ধ-স্বরে আহ্‌মদ্ বলিলেন, "এ প্রাচীরের চিহ্ন রাখিব না। একদিন আমারই শিবিরে আমারই নিকটে গিয়া আপনাকে শান্তি ভিক্ষা করিতে হইবে।" দূরে দুর্গার শিবিকা দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল। দেবরায় আহমদের সগর্ব্ব উক্তির কোন উত্তর দিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল অন্ধকারময় হইয়া গেল। তিনি প্রস্থান করিলে পর মীরফজলুল্লা আহমদের পার্শ্বে আসিয়া বলিলেন, "হিন্দু কি ক্রুদ্ধ হইয়াছে?" আহমদ্ বর্ষাগম্ভীর ভাবে বলিলেন, "শোণিতে ঐ ক্রোধ নির্ব্বাপিত করুন।"

যখন দুর্গার শিবিকা মুসলমান শিবিরে প্রবেশ করিল, তখন শিবিরের এক পার্শ্ব হইতে সহসা একটি কোলাহল উত্থিত হইল। একজন হিন্দু সন্ন্যাসী শোভাযাত্রার কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া সমুদয় অবলোকন করিতেছিল। হুসিয়ার খাঁ তাহাকে সন্দেহক্রমে বন্দী করিয়াছেন। আহ্‌মদ্ সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "সে যদি প্রকৃত ফকির হয়, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বল।" হুসিয়ার খাঁ প্রভাতে আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, সন্ন্যাসী রজনীতে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া আহ্‌মদ্ বিশেষ প্রীত হইলেন বলিয়া বোধ হইল না।

মুসলমান-বাহিনী আপন রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছে। বিজয়-নগরের বক্ষ হইতে যেন ঘোর দুঃস্বপ্ন অপসৃত হইয়াছে। ক্রমে সংবাদ আসিল, বিজয়-নগরের কোষাগার শূন্য করিয়া দেবল যে-সকল ধনরত্ন হস্তিপৃষ্ঠে স্থানান্তরিত করিয়াছিল, তাহা পুনরায় বিজয়-নগরেই ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু দেবলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মায়াপ্পা ও মধুরাও সভাগৃহে যাইতেছিলেন। মায়াপ্পা মধুরাওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধুরাও! দ্রোণাচার্য্যদেব কি প্রস্থানের পূর্ব্বে রাজবংশের উপর অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন?" মধুরাও বলিলেন, "মায়াপ্পা! তোমাকে ত' পূর্ব্বে কতবার বলিয়াছি, তিনি ক্রুদ্ধ হ'ন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ-সন্তান; বশিষ্ঠ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছেন। তিনি আশীর্ব্বাদই করিয়া গিয়াছেন।" মায়াপ্পা বলিলেন, "তবে কেন বিজয়নগরের এ দুর্দ্দশা হইল? বোধ হয়, তিনি অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। অক্ষ-দ্বারা প্রহৃত যুধিষ্ঠিরের ললাট হইতে নির্গত রক্তবিন্দু যদি বিরাটের রাজ্যে পতিত হইত তাহা হইলে মৎস্য-রাজ্য উৎসন্ন হইত। বোধ হয়, সন্ন্যাসীর নেত্র-বারিপাতে বিজয়নগরে অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে।" মধুরাও বলিলেন, অনর্থের জন্য দোষী আমি।"

মায়াপ্পা বলিলেন, "আমি ত তাহা বলি নাই। মধুরাও! তুমি নির্দ্দোষী। এ দুর্দ্দশার জন্য দায়ী সেই বিশ্বাসঘাতক।"

সভায় প্রবেশ করিয়া মায়াপ্পা বলিলেন, "সন্ন্যাসী হইয়াও, তোমাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এই শেষ বার তোমাদের আলোচনায় ব্যাঘাত দান করিতে আসিয়াছি। আমি সকলকে শুনাইয়া একটি কাহিনী বলিতে চাহি"—

মায়াপ্পার মুখকান্তি দেখিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার এক পুত্র সন্তান ছিল। তাহার নাম করিয়া জিহ্বা কলঙ্কিত করিব না। যখন সিরুগুপ্পায় ছিলাম, সে আমারই নিকটে থাকিত, নিজে তাহাকে অস্ত্র-শিক্ষা দিতাম। বুক্কপে সে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিল। যখন অগ্রজের মৃত্যু হইয়াছিল, তখন সামন্তগণের ইচ্ছা ছিল যে আমি সম্রাট্ হই। প্রবীন সামন্তগণের মধ্যে এখন কেহই জীবিত নাই, কিন্তু দেব! তাঁহারা কেহই রাজদ্রোহী বা দেশদ্রোহী ছিলেন না। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, আমি সম্রাট্ হইলে দেশের ইষ্ট-সাধন হইবে। আমি তাঁহাদের বুঝাইলাম, তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিংহাসনে বসিল। মুসলমান সুলতানের হস্তে পরাজয়, পুত্রের শোচনীয় মৃত্যু-এই দুইটী শোকে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া যখন সে অকালে প্রাণত্যাগ করিল, তখন সামন্তরাজগণ আর একবার সেই পুরাতন প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহারা সকলেই বীর, তথাপি শুনিলাম, আমার বীরত্বে তাঁহারা প্রীত হইয়াছেন এবং সেই প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু দেব, আমি জানিতাম, তুমি বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ বুদ্ধিমান্, গুণপণ্ডিত মধু-রাও তোমার শিক্ষাগুরু। ভাবিলাম, বিজয়নগরের সম্রাট্ হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি তুমি। যে-দিন সামন্ত-নৃপতিগণের অনুরোধ দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান করিলাম, সে-দিন আমার পুত্র আমার পার্শ্বে ছিল। কিছু দিন পরে পীড়িত হইয়া সে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিকারে নানারূপ অসংলগ্ন কথা শুনা যায়, তাহাতে আস্থা-স্থাপন করা উচিত নয়; কিন্তু তাহার প্রলাপ শুনিয়া আমি অস্থির হইলাম—সে কেবল রাজসিংহাসন, রাজ্য প্রাপ্তি, রাজমুকুটের কথা। ভাবিলাম, দুর্বৃত্ত উচ্চাশার বশবর্ত্তী হইয়া সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। আমার

মৃত্যুর পর সিন্ধুগুপ্তা তাহার হস্তে যাইবে। সিন্ধুগুপ্তা সাম্রাজ্যের প্রবেশ-দ্বার। যদি এই দুর্গ সে শত্রুহস্তে সমর্পণ করে, রাজ্যের সমূহ বিপদ্ হইবে। ইহা ভাবিয়া সিন্ধুগুপ্তা ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আসিলাম। সন্ন্যাসীর সংস্পর্শ লাভ করিলাম,সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিল। সেই বিশ্বাসঘাতক-কেও কতবার সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু সে তোমার মনোরঞ্জন করিয়া সংসারেই লিপ্ত রহিয়া গেল।”

দেবরায় অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু অধৈর্য্য প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না; বলিলেন, “তাত, সে আমাকে বাস্তবিকই ভালবাসিত। আমার এখন মনে হয়, তাহার হস্তে রাজ্যভার দিয়া না গেলে, সম্রাট্ হইবার বাসনা তাহার মনে জাগিত না।” অসহিষ্ণুভাবে মাধ্বাপ্পা বলিলেন, “না দেব! তুমি ভুল বুঝিয়াছ। ভালবাসা বলিয়া কিছু তাহার হৃদয়ে ছিল না। সে আমাকে কখন ভালবাসিত না, তোমাকেও না। মধুরাওয়ের উমার মত অপূর্ব্বরূপগুণের অধিকারিণী কন্যা যদি তাহার পত্নী হইত, সে তাহাকেও ভালবাসিত না।” দেবরায় নতমস্তকে রহিলেন। মাধ্বাপ্পা বলিতে লাগিলেন, “পাছে সে তোমার অনিষ্ট করে, সেই জন্য তাহাকে আমার নিকটে মন্দির-সংলগ্ন আবাসে রাখিবার চেষ্টা করিতাম। যখন রাজধানীর বাহিরে যাইতাম, প্রয়োজনে, নিষ্প্রয়োজনে তাহাকে সঙ্গে লইতাম। এত সাবধান না হইয়া যদি দেবতার সমক্ষে স্বহস্তে তাহাকে বলি দিতাম, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের কলঙ্ক হইত না।”

দেবরায় বলিলেন, “তাত! গত বিষয় আলোচনা করিয়া আপনি অনর্থক মনঃকষ্ট পাইবেন।” মাধ্বাপ্পা বলিলেন, “মনে স্নেহ থাকিলে কষ্ট হয়, কিন্তু বৎস, তাহার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র স্নেহ নাই। আর সে যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার ক্ষমাও নাই।” দেবরায় বলিলেন, “আমার ভ্রমে হইতেছে, আমার ভুলে সে দুষ্কার্য্যের সুযোগ পাইয়াছিল। ভিন্ন অবস্থায় তাহার ভাগ্য ভিন্নরূপ হইত।”

মাধ্বাপ্পা বলিলেন, “আমিও একবার সেইরূপ আশা করিয়াছিলাম। দুর্গার মুখে মধুরাওয়ের কন্যার কথা প্রায়ই শুনিতাম। ভাবিয়াছিলাম, এরূপ কন্যার সহিত বিবাহ দিলে, বোধ হয়, সে তাহার উচ্চাশা ভুলিয়া যাইতে পারে। ফিরোজ শাহ্‌র পুত্র স্ত্রীরত্ন-লাভ করিয়া সিংহাসন ছাড়িয়া দিল—তাহা আমার মনে বার বার উদয় হইল। সেই জন্য একদিন আমি তোমাকে সে-কথা বলিয়াছিলাম।” মধুরাও বলিলেন, “ও-সব প্রসঙ্গে আর প্রয়োজন নাই। তুমি বিজয়নগর ত্যাগ করিয়া যাইতেছ। যাইবার পূর্ব্বে ভ্রাতুষ্পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, এখন আক্ষেপ, ক্রোধ, জিঘাংসা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দাও।”

মাধ্বাপ্পা বলিলেন, “হাঁ, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, দেব! সুখী হও। তোমরা সকলেই সুখী হও। ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় শত পুত্রের জনক হও—কিন্তু তাহারা যেন সুপুত্র হয়, যেন তাহাদের কীর্ত্তি দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অদ্যই বিজয়নগর ত্যাগ করিব না; মধুরাও! এখনও আমার কাজ শেষ হয় নাই। মধুরাও! আশীর্ব্বাদ আজ করিলাম, পরেও করিব, যতদিন বাঁচিব ইহাদের আশীর্ব্বাদ করিব। কিন্তু অগ্নিশিখায় যেরূপ আলোক থাকে, সেইরূপ উত্তাপ ও ধূমও থাকে। স্বর্গের

মস্তকে মণি থাকে, দন্তে তাহার গরল। আজ আমার আশীর্ব্বাদের মণি ইহাদের কণ্ঠে স্যমন্তকের ন্যায় বিরাজ করিবে; আমার স্নেহের আলোকে ইহাদের তরুণ জীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। মধুরাও! আজ দেবাসুর মিলিয়া আমার হৃদয় মন্থন করিতেছে। মন্থনের শ্রেষ্ঠ ধন অমৃত ইহাদের, আর হলাহলে জর্জ্জরীভূত হইবে সেই বিশ্বাসঘাতক! ইহাদিগকে যে-মুখে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, সেই মুখেই সেই দুর্বৃত্তকে অভিসম্পাত দিব—"

সভাস্থ সকলে আতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষান্ত হউন!" মধুরাও আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, "ক্ষান্ত হও, বৃদ্ধ!" কে ক্ষান্ত হইবে? ভক্ষ্য সমক্ষে দেখিয়া অজগর যেরূপ গর্জ্জন করে, খাণ্ডব-দাহন কালে বুভুক্ষু বৈশ্বানর যেমন গর্জ্জন করিয়াছিলেন, মায়াপ্পাও সেইরূপ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। দুই চক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিয়া পিনাকীর ত্রিশূলের ন্যায় করাঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া মায়াপ্পা বলিতে লাগিলেন, "আমি তাহাকে অভিসম্পাত দিব। যতদিন জীবিত থাকিব এই অভিসম্পাত দিয়া যাইব। ইহজীবনে সুখ শান্তি কাহাকে বলে সে যেন না কখন জানিতে পারে। দিনের আলো যেন চির কালের জন্য তাহার নয়ন হইতে নিবিয়া যায়! যন্ত্রণা, বিভীষিকা, আত্মগ্লানি যেন তাহার নিত্যসহচর হয়! পৃথিবীর ফলমূলে যেন তাহার জন্য মধুর পরিবর্ত্তে বিষ সঞ্চিত থাকে! নদী যেন তাহার স্পর্শে শুকাইয়া যায়। কানন তাহার স্পর্শে যেন দাবানলের মত জলিয়া উঠে! অনন্ত কাল ধরিয়া যেন সে রৌরবনরকের প্রচণ্ড অগ্নিতে দগ্ধ হয়!—"

সেবরায় বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু মধুরাও দ্রুত স্খলিত-পদে আসিয়া মায়াপ্পার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সে আমার যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য আমি তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছি। তুমিও—!" মায়াপ্পা বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি তাহাকে ক্ষমা করিব না। তুমি যদি তাহাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না। তুমিও তাহাকে ক্ষমা করিবার কথা ভুলিয়া যাইবে। কেন ভুলিয়া যাইবে, তাহাই আজ বলিতেছিলাম। শুন তবে—

"আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, দেব! তুমি তাহাকে রাজধানীর ভার প্রদান করিয়া যাইবে। তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না—কারণ, সে সময় বিজয়নগরেই থাকিব ভাবিয়াছিলাম; আর, তাহার ক্ষমতারও সীমা ছিল। কিন্তু যখন তুমি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তাহাকে সম্রাট্ বলিয়া সম্বোধন করিলে, তখন মনে হইল তোমাকে বাধা দিই। আমি তোমার অনেক ইচ্ছায় বাধা দিয়াছি, আমার আচরণ তোমার নিকট নূতন বোধ হইত না। কিন্তু তখন আমি দেখিলাম, সিংহাসন-লাভে দুর্বৃত্তের মুখে হর্ষচিহ্ন প্রকটিত হইল না। সে-মুখে অনিচ্ছা-ভয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই দিন মনে নিজের বদ্ধমূল ধারণার উপর একবার সন্দেহ জন্মিল। বিশ্বাসঘাতকের নরকীয় বুদ্ধি আমার চক্ষে ধূলি দিল। ভাবিবার সময় বেশী ছিল না। তুমি তাহার পর যাহা করিবে, তাহাও আমি জানিতাম। কিন্তু সেই দিনই আমার মত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। মধুরাওয়ের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিতে আমার আর ইচ্ছা ছিল না। বিচলিত হইও না,

যুধুরাও! স্বর্গের দেবীর দোষ থাকে না—তোমার কন্যার দোষ কিছু ছিল না। সে আমার পুত্রবধূ, হইলে তাহাকে যত স্নেহ করিতাম, এখন তাহা অপেক্ষা বেশী স্নেহ করি।” মায়াপ্পা দেখিলেন, দেবরায়ের দৃষ্টি সম্মুখস্থ বেদীর উপর নিবদ্ধ। তিনি বলিতে লাগিলেন, “তোমার পুত্র-কন্যার সঙ্গে কোন পিতার সন্তানের তুলনা হয় না। এখন একটি কথা বলিব—তম্বুরাওয়ের সম্বন্ধে। আজ এখানে চতুর্দ্দিকে যুবকের মুখ দেখিতেছি। যুবক সামন্তগণ! তোমরাও শুন, কিরূপে এক যুবকবীর মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।” মায়াপ্পা থামিলেন। সভায় শুষ্কপত্র পড়িলেও পতন-শব্দ শুনা যাইত। সভার লোক স্পন্দহীন, সভাগৃহের তরঙ্গায়িত শীর্ষ নবকোণ স্তম্ভশ্রেণীর ন্যায় নিশ্চল। মায়াপ্পা বলিলেন, “তোমরা সকলে শুনিয়াছ যে মায়াপ্পা ও তম্বুরাওয়ের দ্বারা গত বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছে। জনরবে অধিক বিশ্বাস করিও না। আজ শুনিবে তম্বুরাও একাকী সে বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন।—

“সে-বিশ্বাসঘাতকের প্রতি আমার বিশ্বাস ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল। রাজপ্রাসাদ রক্ষি-শূন্য করিয়া নগরীর ও উপকণ্ঠের সমস্ত বলিষ্ঠ নাগরিকগণকে স্বয়ং রণসাজে সজ্জিত করিয়া সে সহস্র সহস্র যোদ্ধা সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিল। নিজে আমাকে আমাদের প্রথম জয়-লাভের সংবাদ জানাইল। সিংহাসনে এক দিনও সে উপবেশন করে নাই। সিংহাসনের উপর রাজমুকুট রক্ষা করিয়া বেদীমূলে আসন গ্রহণ করিত। বালকের বুদ্ধির নিকটে বৃদ্ধ মায়াপ্পা প্রতারিত হইল।

“দক্ষিণে পুনরায় সেই ভণ্ড সন্ন্যাসী বিদ্রোহী হইল, এ সংবাদ তোমরা শুনিয়াছ। পার্ব্বত্য সেনা সংগ্রহ করিয়া বিশ্বাসঘাতক অন্য এক বিশ্বাসঘাতকের বিদ্রোহ দমন করিয়া ফিরিয়া আসিল। সে দিন আমি কমলা-পুরে রামস্বামীর মন্দিরের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিলাম, তাহার মুখে শুনিলাম সে স্বহস্তে বিদ্রোহীকে নিহত করিয়াছে। এখন সে আনিগণ্ডীতে তম্বুরাওয়ের নিকট যাইতেছে। সত্যই সে-দিন মনে একটু তৃপ্তি, একটু গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম।

“গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম, ভগবান্ তাহার শাস্তি দিলেন। দুই দিন মন্দির ত্যাগ করি নাই। তৃতীয় দিন কোলাহল শুনিয়া বাহিরে আসিলাম। শুনিলাম, দুর্বৃত্ত আনি-গণ্ডী আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল, চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, পুনর্ব্বার আক্রমণের চেষ্টা চলিতেছে। তার পর বুঝিলাম সংবাদ সত্য। সর্পের দন্ত-মূলে বিষ সঞ্চিত হইয়াছে, সে এইবার দংশন করিবে!

“প্রাসাদ-অভিমুখে চলিলাম—পথে লোকের জনতা, প্রকৃত সংবাদ কাহারও নিকট পাইলাম না। এক সংবাদ দুই জনের মুখে শুনিলাম না। কেবল জানিলাম আনিগণ্ডীতে তম্বুরাও আছেন, রাজধানীতে বিশ্বাসঘাতক সম্রাট্ হইবার স্পর্দ্ধা করিতেছে, আর বিজয়নগরের রাজপথে আমি বৃদ্ধ মায়াপ্পা, নগরীর রাজপথের ন্যায়ই নিরুপায়।

“রাজ-প্রাসাদে গেলাম; দেখিলাম, দক্ষিণ হইতে আনীত পার্ব্বত্য সেনা-দ্বারা পুরী রক্ষিত। তাহারা আমাকে চিনে না। পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। বিশ্বাসঘাতকের দেখা